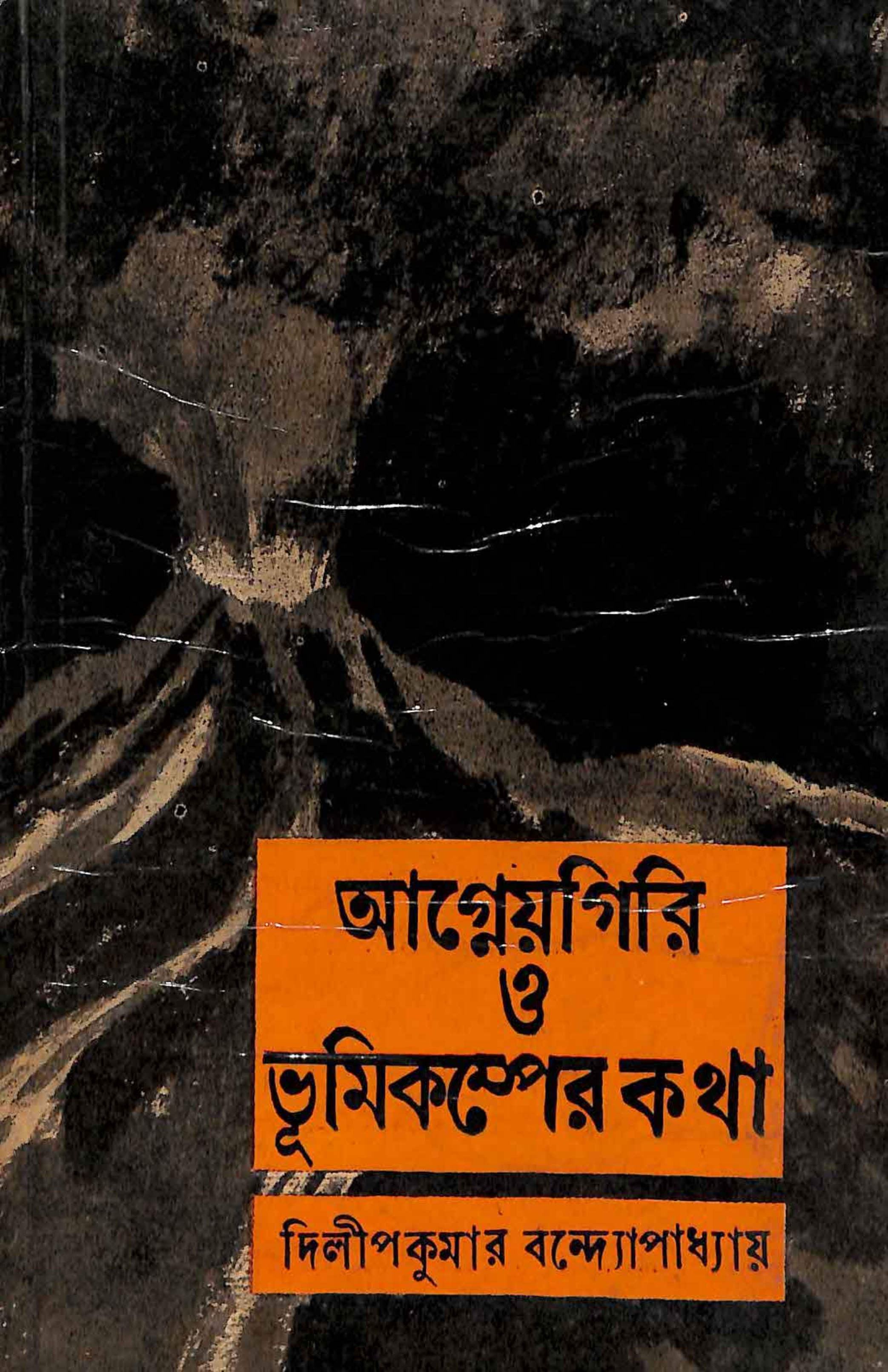


আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের কথা

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

৪০



আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের কথা

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ; ১৯৮০

প্রকাশক :
মৈনাক বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

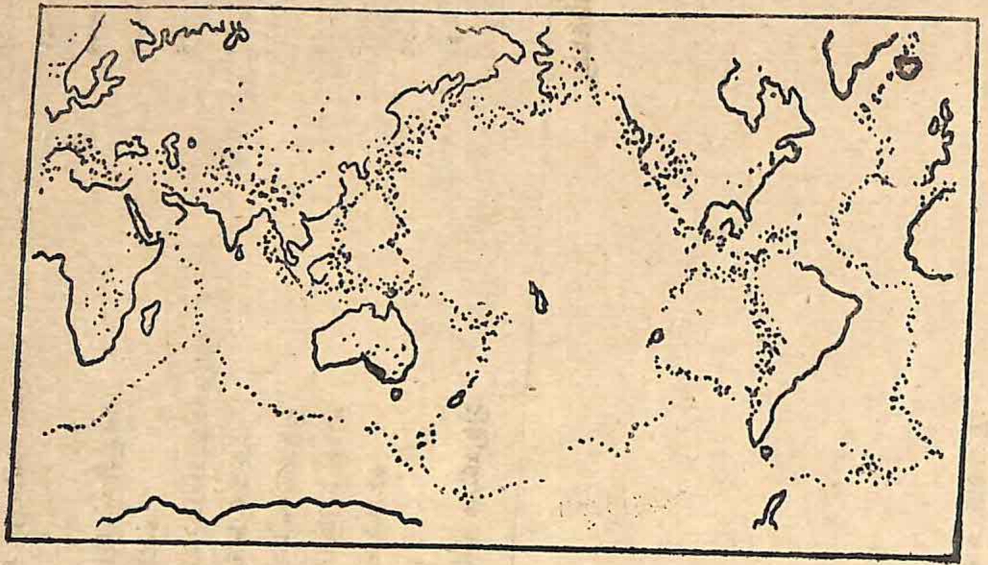
প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : দশ টাকা

শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীমতী মণিকুন্তলা চট্টোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

বিষয়সূচী

সংযোজন : ৭৪ পৃষ্ঠার ছবিটি সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের। ইংরেজি কবিতার বাংলা রূপান্তর করেছেন লেখক।



সারা পৃথিবীতে ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলগুলি বিন্দুর সাহায্যে দেখানো হলো।

১

প্রাচীন কাহিনীতে আগ্নেয়গিরি

সারা পৃথিবীর মহাকাব্য বা পুরাণে আগ্নেয়গিরি নিয়ে যত গল্প-কাহিনী রয়েছে, প্রাকৃতিক আর কোন দুর্যোগ নিয়ে এমনটি রয়েছে বলে জানা যায় না। স্মরণীয় কালের মধ্যে ভারতে তেমন কোন অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে নি। হয়তো তাই ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে আগ্নেয়গিরি প্রায় অনুপস্থিত, যদিও ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাতও ঘটেছে, তবে তা' ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাইরে। হয়তো তাই আমাদের পুরাণ রচয়িতারা তেমনভাবে উদ্বুদ্ধ হননি। অবশ্য আমাদের অগ্নিদেবতা রয়েছেন।

সে যাই হোক না কেন, পশ্চিমের পুরাণ কাহিনী ও মহাকাব্যে অগ্নেয়গিরির বর্ণনা, কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার বিস্তর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করলে দেখা যায়, সে যুগের মানুষ অগ্নেয়গিরিকে ভয় এবং সন্দেহের চোখে দেখেছে। মহাকবি ভারজিল বলেছেন, সিসিলির সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিপদজনক আগ্নেয়-গিরি এটনা পর্বতের গহ্বরে এনকেলাডুস নামে এক দৈত্যকে বন্দী করে রেখেছেন দেবতারা। সেই পরম বলশালী দৈত্যটি যখন তার সব শক্তি নিয়ে পর্বতগুহা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে, তখনই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে প্রাচীনকালে যে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল, আশ্চর্যের ব্যাপার, তারই আশেপাশে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদজনক আগ্নেয়গিরিগুলি। ফলে এইসব অঞ্চলের লোক গাথা বা গানের মধ্যে আগ্নেয়গিরির কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে অগ্নিদেবতা হলেন হেফাইসটাস, যার অর্থ 'জ্বলন্ত'। রোমান পৌরাণিক কাহিনীর অগ্নিদেবতা জুপিটার ও জুনোর পুত্র ভালকান, যিনি দেবতাদের কামার এবং আগ্নেয়গিরির দেবতা। কবির কল্পনায় এমটি সজীব আগ্নেয়গিরি হলো ভালকানের কামারশালা বা হাপর, যা থেকে প্রতিনিয়ত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর ভালকানো যখন তার নেহাইয়ে হাতুড়ি ঠোকে, তখনই বিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। আগুন, ধোঁয়া আর লাভা বেরিয়ে আসে। ইংরেজি ভলকানো (volcano বা আগ্নেয়-গিরি) শব্দের জন্ম ভলাকান দেবতার নাম থেকে।

প্রাচীনকালের সব মানুষই ছিলেন অগ্নিদেবতার উপাসক, তাই ক্রমে সাধারণ নিয়মেই আগ্নেয়গিরি ও অগ্নি তাদের কাছে সমার্থক হয়ে গেছে। এভাবেই লোকগাথার ভেতরে আগ্নেয়গিরির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাছাড়া পৃথিবীর বহু দেশের মানুষই তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আগ্নেয়গিরির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। হয়তো তাই মেকসিকোর পুরনো সব পিরামিডের আকৃতি আগ্নেয়-গিরির মতো, ওপরে আগ্নেয়গিরির মতোই গহ্বর। শুধু তাই নয়, মেকসিকো সিটি শহরের দক্ষিণভাগের এক বিরাট অংশ আগ্নেয়গিরির লাভায় ঢেকে গিয়েছে।

টংগা উপজাতিদের একটি জনপ্রিয় গাথায় রয়েছে, মাউই নামে এক যুবক পাতাল থেকে আগুন চুরি করে পৃথিবীতে নিয়ে আসে, আর তা' থেকেই আগুনের সৃষ্টি।

পলিনেশিয়ার মানুষ আগ্নেয়গিরিকে অগ্নির স্রষ্টা বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে, কিন্তু রোমানরা অগ্নিদেবতা ভালকানকে সর্বনাশা অভিশাপ হিসেবেই দেখেছে। রোমের সম্রাট রমিউলাসের রাজত্বকালে অগ্নি-দেবতা ভালকানের জন্য তৈরি হয় একটি মন্দির, আর তাছাড়া ভালকানকে তুষ্ট রাখবার জন্য প্রতিবছর ২৩শে আগষ্ট ভালকান দেবতার উৎসব পালিত হতো। এই উৎসবে ভালকানকে বহু কিছু

উৎসর্গ করা হতো কেবলমাত্র এই প্রার্থনায়, যাতে সে বছর অগ্নি বা আগ্নেয়গিরি থেকে কোন রকম দৈব ছুর্বিপাক না হয়।

হাওয়াই দ্বীপের মানুষ অগ্নিদেবী হিসেবে পূজো করে মাদাম পেলেকে। হাওয়াই দ্বীপের গল্পগাথা থেকে জানা যায়, মাদাম পেলে নাকি মাঝে মাঝেই বাসস্থানের খোঁজে হাওয়াই দ্বীপে আসেন। এবং উনি এলেই সৃষ্টি হয় আগ্নেয়গিরির। এভাবেই নাকি সৃষ্টি হয়েছে হাওয়াই দ্বীপের সজীব আগ্নেয়গিরি কিলাউরি। ওদের বিশ্বাস, মাদাম পেলে খুবই প্রতিহিংসা পরায়ণ দেবী, বন্ধুদের রক্ষা করেন কিন্তু শত্রুদের খতম করেন নির্মমভাবে।

আগ্নেয়গিরি প্রধান অঞ্চলগুলিতে যারা বসবাস করেন, তাদের জীবনযাত্রার ওপরে আগ্নেয়গিরি স্বাভাবিক নিয়মেই প্রভাব বিস্তার করে। যেমন জাপানে সর্বনাশা আগ্নেয়গিরির ধ্বংসলীলা বন্ধ করবার জন্য রয়েছে পূজা-উপাসনার প্রথা। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এ ধরনের আগ্নেয়গিরির হোতা দেবদেবীর পূজা-উপাসনার মূল কারণ আগ্নেয়গিরির নীল আতংক। জাপানের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি ফুজিয়ামা (যার অর্থ মৃত্যুহীন পাহাড়) বহু জাপানীর কাছেই অত্যন্ত পবিত্র। প্রায় পঞ্চাশ হাজার জাপানী ফুজিয়ামার অগ্নিমুখে পূজো দিতে যায় প্রতি বছর। এমন কি মাঝে মধ্যে ছুয়েকজন জাপানী এই অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যাও করে শুধু এই প্রত্যাশায়, যে এর ফলে অনন্ত শান্তি মিলবে।

গ্রীক ও রোমানদের প্রাচীন কাহিনীতে আগ্নেয়গিরি নিয়ে যে গল্পগাথা রয়েছে, ক্রমে তাই একদিন বিজ্ঞানের রূপ নেয়। যদিও একথা বলে নেওয়া ভালো আগ্নেয়গিরি সম্পর্কিত বিজ্ঞান যথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য, বিচার বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি। তবে সেই প্রাচীনকালে বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খৃঃ পূঃ), অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ), ভূগোলবিদ স্ট্যাবো (৬৩ খৃঃ পূঃ-২১ খৃঃ), ছোট প্লিনি প্রমুখদের চিন্তায় ও বিশ্লেষণে আগ্নেয়গিরিতত্ত্ব

ক্রমে গড়ে ওঠে। প্লেটো এবং অ্যারিসটটলের মতে ভূগর্ভের বন্দী বাতাসের চাপে ভূমিকম্পের জন্ম, আর সেই হাওয়ার প্রভাবে গন্ধক কিংবা কয়লার স্তরে আগুন ধরে গিয়ে আগ্নেয়গিরর সৃষ্টি। তৎকালীন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ স্ট্যাবোর মতে, ভূমিকম্পের ফলেই নাকি ইতালি থেকে সিসিলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং তারই ফলে যে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, তারই মধ্য দিয়ে ভূগর্ভের বন্দী বাতাস এবং আগুন বাইরে বেরিয়ে আসে। এভাবেই ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে সৃষ্টি হয়েছে এটনা, লিপারি, ইশচিয়ার আগ্নেয়গিরি। স্ট্যাবোর ধারণা ছিল, আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়ে ভূগর্ভের দূষিত বাতাস ও আগুন বেরিয়ে আসে। আর এভাবেই কমে যায় ভূমিকম্পের প্রকোপ। স্ট্যাবোর এই ভাবনার মধ্যে আধুনিক চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়।

বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেকসপিয়ারও আগ্নেয়গিরির ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকতে পারেন নি। তাই তাঁর নাটক 'হেনরি দ্য ফোর্থ' এ রয়েছে—

অসুস্থ প্রকৃতি মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়ে
আশ্চর্য অগ্ন্যুৎপাতে ; প্রায়ই বিশাল পৃথিবীর
গর্ভে যন্ত্রণা, বিরক্তি যাতনা।
দায়ী ঐ গর্ভবন্দী দুর্বিনীত বাতাসের দল ;
যারা কাঁপিয়ে দিচ্ছে বুড়ো বিশৃংখল পৃথিবীটাকে,
ভেঙ্গে ফেলেছে শ্যাওলা জড়ানো উঁচু গীর্জাগুলিকে।

শেকসপিয়ারের লেখা পড়লে বোঝা যায়, আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে তৎকালীন চিন্তার প্রতিফলনই ঘটেছে ওর লেখায়।

লিপারি বা এয়োলিয়ান দ্বীপপুঞ্জের নাম প্রাচীন গ্রীক কাহিনীতে পাওয়া যায়। সেখানে এর নাম বায়ুর দেবতা 'ইয়োলাসের বাসভূমি'। কেউ কেউ বলেন ইয়োলাস আসলে এক গ্রীক যুবরাজ, যিনি এই দ্বীপপুঞ্জ শাসন করতেন। বুদ্ধিমান রাজা স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির

গ্যাস উদগীরণের সঙ্গে আবহাওয়ার একটা যোগাযোগ লক্ষ্য করেন। সেই দ্বীপের মৎস্যজীবি অধিবাসীদের প্রতিদিন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ওপর নির্ভর করতে হতো। এভাবেই ক্রমে কয়েক পুরুষ বাদে রাজা ইয়োলাসই পরিচিত হন দেবতা—বায়ুদেবতা হিসেবে। সে যাইহোক এখনো এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা আগামী-কালের আবহাওয়া আন্দাজ করবার জন্য আগ্নেয়গিরির ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

প্রাচীন মানুষের মনে আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে ভয় ভীতি ও নানা কুসংস্কার থাকলেও পরে ক্রমে তা' থেকে জন্ম নেয় বিজ্ঞান চেতনা। বিজ্ঞানীরা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন আগ্নেয়গিরির কার্যকরণ সম্পর্ক-গুলি। এভাবে মানুষ আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে পূর্বাভাস করতে ও আগ্নেয়গিরি-জাত উত্তাপকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাতে শিখছিল।

২

আগ্নেয়গিরি কী?

'আগ্নেয়গিরি কী?' এ ধরণের প্রশ্নে অনেকেই হয়তো আলগা-ভাবে উত্তর দেবে, 'কী আবার! আগ্নেয়গিরি হচ্ছে এমন এক জ্বলন্ত পাহাড়, যার মাথা থেকে খালি ধোঁয়া আর আগুন বেরোচ্ছে।'

এ ধরণের উত্তর, যা আজো হামেশাই দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে কিন্তু রয়ে গেছে অনেক ভুল আর অসত্য। প্রথমত জ্বলন্ত কথাটা ঠিক নয়, কারণ সত্যি সত্যিই কাঠ কিংবা কয়লার মতো কিছু থাকে না আগ্নেয়গিরির মাথায়। আরেকটা কথা, নামে আগ্নেয়গিরি হলেও, সব সময় কিন্তু আগ্নেয়গিরি 'গিরি' বা পাহাড় নয়। কারণ সমতল ভূমিতেও আগ্নেয়গিরির জন্ম হতে পারে। আর যে ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে, তাও কিন্তু ঠিক ধোঁয়া নয়, আসলে ঘনীভূত বাষ্প

ও অন্যান্য গ্যাস যার সঙ্গে অনেক ধুলো-বালি মিশে তৈরী হয়েছে কালো রং। এবং এই মেঘের ওপর নিচের আগুন-গলা বস্তুর প্রতিফলনই আগুনের প্রতিভাস সৃষ্টি করে।

প্রচুর ঘন গ্যাস, জলীয় বাষ্প এবং ছাই—বিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির এই হলো পরিচিতি রূপ। আগ্নেয়গিরি-নির্গত গ্যাস ও বাষ্পের রং লাল হবে না কালো হবে—এটা নির্ভর করে গ্যাসের উত্তাপ ও অন্তর্গত ছাইয়ের পরিমাণের ওপর। আগ্নেয়গিরি-নির্গত লাভার উত্তাপ যথেষ্টই, তবু আগ্নেয়গিরিতে পোড়ার ব্যাপারটা নগণ্যই বলা চলে। তবে কিছু দাহ্য গ্যাস যেমন হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস পুড়তে দেখা যায় আগ্নেয়গিরিতে।

আগ্নেয়গিরি নিয়ে আলোচনা করতে বসলে দেখা যায়, আগ্নেয়গিরি কী তা' বলার চেয়ে আগ্নেয়গিরি কী নয়, তা' বলা বরং অনেক সহজ। সাধারণভাবে আগ্নেয়গিরি বলতে আমরা বুঝি, এমন এক পাহাড় বা সমতলে স্থিত নলের মতো পাইপ বা জ্বালামুখ যার ভেতর থেকে আচমকা বেরিয়ে আসে গলিত লাভার স্রোত, পাথরের টুকরো, ছাই অথবা বিষাক্ত কালো, ধূসর অথবা সাদা রংয়ের গ্যাসের কুণ্ডলী। ভেতরের প্রবল চাপে গলিত লাভা অথবা বাষ্প ও গ্যাস বেরিয়ে আসবার সময় ভেতরের দেওয়ালে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। ফলে অনেক সময়েই শক্ত লাভা অথবা পাথরের তৈরি লাভা বেরিয়ে আসবার পথটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূরে দূরান্তরে। যে সব লাভা খুব তরল নয়, অনেকটা আলকাতরার মতো আঁটালো ও চটচটে (viscous), সেই লাভা থেকে খুব সহজেই পাইরোক্লাস্ট গঠিত হতে পারে। সাধারণত প্রায় সমস্ত আগ্নেয়গিরি থেকেই প্রথম অবস্থায় গলিত তরল লাভার স্রোতের বদলে জমাট বাঁধা লাভার ভাঙ্গা টুকরো সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বেরিয়ে আসে। ফলে তরল লাভা নির্গমনের পথ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। শক্ত নিরেট জমাট বাঁধা লাভার তৈরি পাথরের টুকরোগুলোর আকৃতি ও

আয়তন অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। এই পাথরের টুকরো আকারে বেশ বড় হলে এর নাম হয় ভলকানিক ব্লক বা ভলকানিক বম্ব বা আগ্নেয় বোমা। যদি এগুলি আকারে ছোট হয়, তবে অনেক সময় একে বলা হয়—ল্যাপিলি (lapilli) বা সিনডার (cinder)। আর আকারে যখন নদীর সাধারণ বালির মতো, তখন এরা আগ্নেয় ছাই বা volcanic ash। এই সমস্ত ছাই জলের তলায় জমে জমে পাথরের আকার ধারণ করে হয় টুফ (tuff)।

আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের দ্বিতীয় পর্যায়ে তরল লাভা প্রধান গহ্বরের পথ বেয়ে ওপরের দিকে চলে আসে। তারপর পাহাড়ের ঢাল যদি থাকে, তবে সেই ঢাল বেয়ে নামতে থাকে নিচের দিকে। সেই প্রলয়ংকর গলিত লাভার স্রোতের নিচে চাপা পড়ে যায় পাহাড়, বন, নদী, নালা, সমৃদ্ধ জনপদ—সব কিছু। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয় গলিত লাভার তাণ্ডব। যে লাভা বেশি তরল অবস্থায় থাকে, সেই লাভার পক্ষেই বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকা লাভার সমুদ্রে ঢেকে দেওয়া সম্ভব। আবার অন্যদিকে যে লাভা আলকাতরার মতো আঁঠালো, সেই লাভার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে খুব বেশি দূরে গড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ তার আগেই এই লাভা জমাট বেঁধে শক্ত নিরেট পাথরের আকার ধারণ করে। লাভার প্রসঙ্গে আর একটি কথা জেনে রাখা উচিত—দুধের মতো তরল অথবা আলকাতরার মতো আঁঠালো হওয়া নির্ভর করে লাভার রাসায়নিক সংযুতির (chemical composition) ওপর। যদি লাভার সিলিকন ডাই-অক্সাইডের (si O_2) পরিমাণ অতিরিক্ত হয়, তবে সাধারণভাবে লাভার প্রকৃতি কিছুটা আঁঠালো ও চটচটে হয়ে থাকে। অন্যদিকে যদি সিলিকন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ তুলনা-মূলকভাবে কম থাকে, তবে লাভার স্রোত ভয়ংকর আগুনের ঝরণার রূপ নিয়ে আগ্নেয়গিরির ঢাল বেয়ে নেমে আসে নিচের দিকে।

বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভার রাসায়নিক সংযুতি

প্রায়ই এক রকমের হয় না। রাসায়নিক সংযুতির পার্থক্য অনুযায়ী এইসব আগ্নেয় লাভার বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। যেমন রায়োলাইট (thyolite), ট্র্যাকাইট (trachyte), ড্যামাইট (dacite), অ্যানডেসাইট (andesite) অথবা ব্যাসল্ট। ব্যাসল্ট লাভার মধ্যে চটচটে ভাবটা কম হওয়ায় তরলায়িত অবস্থায় আগ্নেয়গিরি থেকে অনেক দূরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অঞ্চলে এই পাথর বেশি দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (Deccan trap) কথা, যার আয়তন প্রায় ২০,০০০ বর্গমাইল এবং এই ব্যাসল্ট পাথরেই গঠিত—কোন কোন জায়গায় প্রায় তিন হাজার মিটার পুরু। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা। আগ্নেয়গিরি থেকে সাধারণত দু'ভাবে লাভা নিসৃত হয়। প্রথমত কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় নল-জাতীয় নির্গমন পথ দিয়ে লাভার স্রোত বেরিয়ে আসতে পারে (কেন্দ্রীয় অগ্ন্যুৎপাত)। আর কোন কোন সময় ভূপৃষ্ঠে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত লম্বা ফাটলের মুখ দিয়ে নির্গত হতে পারে গলিত স্রোত (ফাটলবাহী অগ্ন্যুৎপাত)।

প্রায়ই দেখা যায়, তরল লাভার উদগীরণের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়-গিরির জ্বালা মুখ (crater) বেরিয়ে আসে বিশাল আয়তনের গ্যাসের কুণ্ডলী। এই গ্যাসের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগই জলীয় বাষ্প। অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, সালফাইড, হাইড্রোজেন, গন্ধক, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন মনোকসাইড, হাইড্রোকার্বন গ্যাস, বোরিক অ্যাসিড, বোরন, ক্লোরিন, ফসফরাস, আরসেনিক গ্যাস ইত্যাদি।

আগ্নেয়গিরি নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করছেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, আগ্নেয়গিরির উদগীরণের পেছনে রয়েছে মূলত নানা গ্যাস ও বাষ্পের অবদান। এ কথার যুক্তি একটু চিন্তাভাবনা

করলেই বুঝতে পারা যাবে। জল জমে বরফ হলে আয়তনে বাড়ে এবং তার চাপ নেহাৎ কম নয়। কিন্তু জল যখন বাষ্পে পরিণত, তখন তার আয়তন বাড়ে বহুগুণ অন্তত হাজার গুণ তো বটেই। এবং সেই বর্দ্ধিত আয়তনের চাপ যে কত প্রচণ্ড, তা সহজেই অনুমান করা যায়। একথা আগেই বলা হয়েছে, আগ্নেয়গিরি থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসে, তার মধ্যে বেশির ভাগটাই জলীয় বাষ্প। এবার প্রশ্ন, আগ্নেয়গিরির ভেতরে জল আসে কোত্থেকে, আর তা' জলীয় বাষ্প হয় কোন প্রক্রিয়ায়। স্কপ, লিয়েল প্রমুখ ভূবিজ্ঞানী বলেছেন, ম্যাগমার (যা আসলে গলিত পাথর) ভেতরে থাকে জল, আর চাপের প্রভাবে পাথরের স্তরে ভাঁজ পড়লে ভেতরে চাপ কমে যায়, ফলে সহজেই জল পরিণত হয় বাষ্পে। বর্দ্ধিত আয়তনের বাষ্পের প্রচণ্ড চাপ আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ঘটাতে সক্ষম।

আগ্নেয়গিরির উদগীরণের এইটিই মূল রহস্য হলেও, আগ্নেয়গিরির ভেতরে জল কী করে এলো, এ নিয়ে বিস্তর তর্ক বিতর্ক চলেছে বহুদিন। লিয়েলের ধারণা ছিল, আগ্নেয়গিরিগুলোর বেশির ভাগই যখন সমুদ্রের ধারে কাছে গড়ে উঠেছে, তখন একথা মানতেই হবে সমুদ্রই জল জুগিয়েছে আগ্নেয়গিরিগুলিকে। আবার কোন কোন ভূবিজ্ঞানী বলেছেন, সমুদ্রের জল নয়, বৃষ্টির জলই আগ্নেয়গিরিগুলির প্রধান ভরসা। বিশ শতকে অবশ্য সব বিজ্ঞানীরাই মেনে নিয়েছেন, সমুদ্রের জল কিংবা বৃষ্টির জল—কোনটাই নয়, আগ্নেয়গিরির নিজের ভেতরেই রয়েছে জল। কীভাবে কার মধ্যে সেকথা তো আগেই বলা হয়েছে।

ভূবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করেন, আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি নয়। ডঃ ব্রুন (১৯১১ খৃঃ) এ ধারণা পোষণ করলেও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিশেষ কেউ ওকে সমর্থন করেননি। শুধু তাই নয়, ডঃ ব্রুনের তত্ত্ব যে ভুল একথা প্রমাণ করবার জন্য অনেকেই আদাজল

খেয়ে লাগলেন। দুজন আমেরিকান আগ্নেয়গিরি বিজ্ঞানী ডঃ আর্থার ডে এবং ডঃ শেপার্ড তো হাওয়াই দ্বীপের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভেতরে হুদ্দাড় করে নেমে লাভা নিঃসৃত গ্যাস সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। এই অসমসাহসিক অ্যাডভেনচারে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসেবে কেবল পরে নিয়েছিলেন গ্যাস মুখোশ। এটা ১৯১২ সালের কথা। যে ২৪টা বোতলে ওরা গ্যাসের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেল, তার মধ্যে বাষ্পের আয়তনের পরিমাণ শতকরা ৬৮·২ ভাগ। এরপর কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং গন্ধক-গ্যাসের স্থান। ম্যাগমার মধ্যে যে জল থাকে, এ ধারণাটিকেও নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী গোরানসন। ওর পরীক্ষায় প্রমাণিত, যে ম্যাগমার ভেতরে শতকরা ৬ থেকে ৯ ভাগ পর্যন্ত জল থাকতে পারে। পরবর্তীকালের আরো নানা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সব আগ্নেয়গিরির গ্যাসের উপাদান এক নয়, অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে জলের পরিমাণ বেশি। তবে সমুদ্র অঞ্চলের আগ্নেয়-গিরির গ্যাসের সঙ্গে মহাদেশীয় অঞ্চলের আগ্নেয়গিরির গ্যাসের কিছুটা তফাৎ লক্ষ করা গেছে। যেমন সমুদ্র অঞ্চলের আগ্নেয়গিরির গ্যাসের মধ্যে গন্ধক বেশি, ক্লোরিন কম। কিন্তু মহাদেশীয় অঞ্চলের আগ্নেয়গিরির গ্যাসের ভেতরে গন্ধক কম, কিন্তু ক্লোরিন বেশি।

আগ্নেয়গিরি নিস্থত গ্যাস নিয়ে গবেষণা করতে করতে জনকয়েক ভূবিজ্ঞানীর মনে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর আবহামণ্ডল ও সমুদ্র নিয়ে কয়েকটি চিন্তাও মগজে এসেছে। ভূবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, আদিম পৃথিবীর তুলনায় বর্তমান পৃথিবীতে জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন এবং গন্ধকের পরিমাণ বেশি। ভূবিজ্ঞানী রুবির ধারণা, এর পেছনে রয়েছে আগ্নেয়গিরিজাত গ্যাসের অবদান। সমুদ্র-জলের প্রসঙ্গে উনি বলেছেন, ৪০ কিলোমিটার পুরু আগ্নেয়শিলা তৈরি হতে ম্যাগমা

থেকে যে পরিমাণ জল মুক্ত হবে, তার পরিমাণ বর্তমান পৃথিবীর সব সমুদ্রের আয়তনের সমান।

একটি আগ্নেয়গিরি ক্রমান্বয়ে কীভাবে গড়ে ওঠে, তা একটু আগেই বলা হয়েছে সংক্ষেপে। এবার তবে আগ্নেয়গিরির কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। শংকু আকৃতির আগ্নেয়গিরির শরীর, যার শীর্ষে থাকে জ্বালামুখ (crater), তার নাম কোণ (cone)। বাংলায় বলা যেতে পারে আগ্নেয়শংকু। এই আগ্নেয়শংকুর আকৃতি বা আকার কেমন হবে তা মূলত নির্ভর করে আগ্নেয়গিরির চিমনি বা নল দিয়ে কতটা কেমন প্রকৃতির লাভা ও ছাইটাই (ash) কতদিন ধরে বেরিয়ে আসে। একথা তো সহজেই বুঝতে পারা যায়, যে আগ্নেয়গিরি থেকে বেশিদিন ধরে প্রচুর পরিমাণে লাভা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ছাই, পাথর কুঁচি ইত্যাদি বেরিয়েছে সেই আগ্নেয়শংকুর আকার স্বাভাবিক নিয়মেই বড়সড় হবে। আর যে আগ্নেয়গিরি থেকে কেবল আগ্নেয় গ্যাস ও বাষ্প বেরোয়, লাভা বেরোয় না, সেই আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়শংকু তেমন পরিপুষ্ট হবে না। আর একটা কথা আগেই বলা হয়েছে, তবু আবার বলছি। যে আগ্নেয়গিরির লাভা খুব তরল, প্রায় জলের মতো, তা আগ্নেয়গিরির পাইপ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বেরোলেও ছড়িয়ে পড়ে দূরে দূরান্তরে। ফলে এসব আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়শংকুও তেমনভাবে গঠিত হতে পারে না। বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরির ঢাল ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি পর্যন্ত। তবে এর ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে। আর এই আগ্নেয়শংকুর শরীর তৈরি হয় লাভা, ছাই ও আগ্নেয়গিরি নির্গত পাথর কুঁচি দিয়ে। কিছু কিছু আগ্নেয়শংকু খুব কম সময়ে বিরাট হয়ে ওঠে, তারও উদাহরণ আছে। যেমন মেকসিকোর পারিকুটিন আগ্নেয়গিরি। যার আগ্নেয়শংকুর উচ্চতা মাত্র এক সপ্তাহে বেড়ে হয় ৪৫০ ফিট। তারপর দ্বিতীয় মাসে দাঁড়ায় ১০০০ ফিটে। দ্রুত গড়ে ওঠবার দিক থেকে এটি নিঃসন্দেহে একটি রেকর্ড।

আগ্নেয়শংকুর মাথায় থাকে জ্বালমুখ বা (crater), যা দিয়ে নিচের পাইপ বেয়ে উঠে আসা লাভা, গ্যাসট্যাস বেরিয়ে আসে। এসব ক্ষেত্রে পাইপের মাপ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতোই। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাতের চাপে জ্বালামুখ ভেঙ্গে উড়ে যায়, বেরিয়ে পড়ে অনেক বড় মাপের জ্বালামুখ। এ ধরনের জ্বালামুখের নাম অতি জ্বালামুখ (বা caldera)। যে সব আগ্নেয়গিরি থেকে ধীরে সুস্থে লাভা এবং গ্যাস বেরিয়ে আসে, সেসব আগ্নেয়গিরিতে কলডেরা স্বাভাবিক কারণেই তৈরি হয় না। বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতই কলডেরা গঠনের মূল কারণ। ১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়ার বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতে আগ্নেয়গিরির জ্বালমুখ ভেঙ্গে উড়ে গিয়ে তৈরি হয়েছিল কলডেরা বা অতি জ্বালামুখ। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে, সত্যি সত্যি আগ্নেয়গিরির শীর্ষে দাঁড়িয়ে কোনটি জ্বালামুখ, আবার কোনটা অতি জ্বালামুখ—তা' সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুব কষ্টকর। তবে সাধারণত অতি জ্বালামুখের আকার বড়, আকৃতি গোল। এর ব্যাস এক মাইল বা তারও বেশী হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্বালামুখ বা অতি জ্বালামুখ জলে ভর্তি হয়ে সুন্দর লেক তৈরি হয়। যা একদিন ছিল অগ্নিময়, আজ তাই জলময় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তৈরি করে। এমনি একটি সুন্দর হ্রদের উদাহরণ আমেরিকার দক্ষিণ অরিগোন অঞ্চলের জ্বালামুখ হ্রদ (crater lake)। জ্বালামুখ হ্রদ বললেও আসলে এটি অতি জ্বালামুখ হ্রদ। এই হ্রদের ব্যাস প্রায় ৬ মাইল (প্রায় ৯.৫ কিলোমিটার)। গভীরতা ২০০০ ফিট (৬০ মিটার) পর্যন্ত। এর অবস্থান প্রায় ১২০০০ ফিট উচ্চতায়। বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ডিলার প্রমাণ করেন এটি আসলে একটি কলডেরা, এর জন্ম জ্বালামুখ ভেঙ্গে বসে যাবার ফলে।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে ইংরেজ কবি টেনিসনের একটি কবিতা উদ্ধৃত করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ কবিতাটি আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ সম্পর্কে।

কোন অগ্নিময় পর্বতশীর্ষ থেকে
কে এত জোরে উৎক্ষিপ্ত করল ভয়ংকর ছাই,
যা প্রদক্ষিণ করে ফেলে পৃথিবীকে দিনের পর দিন।
বহু রক্তঝরা সন্ধ্যা ও অভিশপ্ত সূর্যাস্তকে
এভাবেই রাঙ্গিয়ে দেয় বহুদিন।

বলতে দ্বিধা নেই, আগ্নেয়গিরি যে কী, তা মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিলেন কবি টেনিসন।

৩

আগ্নেয়গিরি কত রকমের

অগ্ন্যুৎপাতের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী আগ্নেয়গিরিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে, তাকে বলা হয় সজীব বা জীবন্ত আগ্নেয়-গিরি (active volcano)। আর যে আগ্নেয়গিরি থেকে কচিৎ কদাচ বিস্ফোরণ ঘটে, তার নাম ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি (dormant volcano)। এছাড়া যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে সুদূর অতীতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের মধ্যে আর লাভা বা গ্যাস নিস্থত হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তা মৃত আগ্নেয়গিরি। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির উদাহরণ হিসেবে ইতালির মাউন্ট এটনা, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিলাউরি আগ্নেয়গিরির নাম উল্লেখ করা যায়। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি হিসেবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ব্যারেন দ্বীপ ও নারকোনডাম দ্বীপের নাম করা যেতে পারে। ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি থেকে ১৭৯৫ ও ১৮০৩ সালে অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ পাওয়া যায়। নারকোনডাম দ্বীপের আগ্নেয়গিরি সজীব ছিল প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে প্লায়াস্টোসিন (Pleistocene) যুগে। তার

পরের কোন যুগে এর সুপ্তি ঘোচেনি। একমাত্র আগামী যুগের ইতিহাসই বলতে পারে, এই ঘুম আর কোনদিন ভাঙ্গবে কিনা। নারকোনডাম দ্বীপের আগ্নেয়গিরিকে 'মৃত' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তবে মৃত আগ্নেয়গিরি প্রসঙ্গে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা উচিত, কোন অবস্থাতেই সুনিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয় যে, মৃত আগ্নেয়গিরি আর কোনদিনই সজীব হয়ে উঠবে না।

এছাড়া সজীব বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের প্রকৃতি ও ধ্বংসের পরিমাণ অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

আগ্নেয় পাইপ জাতীয় (Volcanic pipe)

সবচেয়ে শান্ত প্রকৃতির আগ্নেয়গিরি এই জাতের মধ্যে পড়ে। কেবল গ্যাস বেরোয়, লাভাটাভা কচিৎ কখনো বেরোতে পারে। এতে থাকে গ্যাস বেরোনোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় পাইপ, তবে তা' ওপরের দিকে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ছড়ানো। এ ধরনের আগ্নেয়-গিরির দেখা মেলে জার্মানির রাইন উপত্যকায়। স্থানীয় নাম 'মার'। কেন্দ্রীয় পাইপটি অধিকাংশ সময়েই জলে ভর্তি থাকে। কেন্দ্রীয় পাইপের ব্যাস ২৫০ থেকে ৩০০০ মিটারের মধ্যে। এ ধরনের পাইপের ভেতরে থাকে শক্ত জমাট বাঁধা আগ্নেয়শিলা। এ রকম আগ্নেয় পাইপের দেখা মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কিমবারলিতে। এখানে এই আগ্নেয় পাইপের মধ্যে পাওয়া গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্মূল্য রত্ন—হীরা। অবশ্য এই হীরাবাহী আগ্নেয় পাইপ রাইন উপত্যকার মতো জলভর্তি নয়। সাম্প্রতিককালে সোভিয়েট রাশিয়ার ইয়াকুটিয়া একই ধরনের হীরাবাহী আগ্নেয় পাইপ আবিষ্কৃত হয়েছে। একথা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, এ ধরনের হীরাবাহী আগ্নেয় পাইপের অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম।

হাওয়াই জাতীয় (Hawaian type)

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এ জাতীয় আগ্নেয়গিরির দেখা মেলে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অঞ্চলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন ক্যাপ্টেন কুক ১৭৭৪ সালে। তবে ক্যাপ্টেন কুক এই দ্বীপপুঞ্জের নাম দিয়েছিলেন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ, বৃটিশ নৌবাহিনীর প্রধানের নামে। ক্যাপ্টেন কুককে এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা প্রথমে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, কিন্তু পরের বছর ওদের হাতেই নিহত হন তিনি। এই হাওয়াই দ্বীপ কিন্তু হাওয়া দিয়ে তৈরি নয়, বরং বলা যায় সমস্ত দ্বীপপুঞ্জই আগ্নেয়গিরি নির্গত লাভা দিয়ে তৈরি। এই দ্বীপপুঞ্জের হু'টি উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়গিরির নাম মোনা লোয়া এবং কিলাউয়ি আগ্নেয়গিরি।

এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে লম্বা ফাটল, (যা লম্বায় কয়েক মাইল লম্বা হতে পারে) এমন ফাটল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে তরল লাভা বেরিয়ে আসে। তবে লাভার প্রকৃতি ও গতি শান্ত। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নদীর মতো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি কখনো কখনো সমুদ্রেও চলে যায়। পাহাড় থেকে গড়িয়ে নিচে নামবার সময় কখনো লাভার ঝরনাও তৈরি হয়। এভাবেই লাভা জমে গড়ে ওঠে লাভার গম্বুজ। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপটি আসলে পাঁচটি আগ্নেয়গিরির সমন্বয়ে গঠিত। এর প্রধান হু'টি আগ্নেয়গিরি, যাদের নাম একটু আগেই বলা হয়েছে তারা এখনো সজীব ও জীবন্ত। এই হু'টি আগ্নেয়গিরি থেকে ক্রমাগত লাভা উদ্গীরণের ফলে দ্বীপটি ক্রমশ বেড়ে উঠছে আয়তনে। এই হু'টি আগ্নেয়গিরিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে হাওয়াই ন্যাশনাল পার্ক।

স্ট্রমবলি জাতীয় (Strombolian type)

সিসিলির উত্তরে লিপারি দ্বীপপুঞ্জের স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির নামে এর নামকরণ। এই জাতীয় আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে। লাভার প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত কম তরল হওয়ায় অগ্ন্যুৎপাতের সময় লাভার জমাট খণ্ড প্রায়ই আকাশের

দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবার বিস্ফোরণের সময় আগ্নেয়গিরি জ্বালমুখ নিঃসৃত গ্যাসে ক্ষণিকের জন্য আগুন ধরে যাওয়ায় দূর থেকে দেওয়ালীর আলো বলে ভুল হতে পারে। এই কারণে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরিকে অনেকে আদর করে ভূমধ্যসাগরের লাইট হাউস বলে ডাকে। স্ট্রমবলি জাতীয় আগ্নেয়গিরি কথা প্রথম বলে ভূবিজ্ঞানী মারসেল্লি।

আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার ব্যাপারে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে অতীতকাল থেকে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির প্রকৃতি তেমন কিছু বদলায় নি। তাছাড়া যাতায়াতের সুবিধে ও প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত হয় বলে অনেক ভূবিজ্ঞানীই স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির গঠন নিখুঁত শঙ্কু আকৃতির (cone-shaped)। সমুদ্রের পিঠ থেকে ৩০-৪০ ফিট উঁচু। অধ্যাপক পনটির মতে ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু সজীব আগ্নেয়গিরি হলো স্ট্রমবলি। এর জ্বালামুখের আকৃতি ডিমের মতো, ভেতরে রয়েছে জমাট লাভা ও ভাঙ্গা পাথরের টুকরো। এই আগ্নেয়গিরির কাছেই রয়েছে দু'টি গ্রাম—সান ভিনসেনজো ও গিনোস্ত্রা। লোকসংখ্যা প্রায় এক হাজার।

ভালকানো জাতীয় (Vulcanian type)

এয়োলিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ভালকানো আগ্নেয়গিরির নামে এর নামকরণ। এই জাতীয় লাভা অত্যন্ত চটচটে ও আঁঠালো, খুব সহজেই জমাট বেঁধে শক্ত নিরেট হয়ে যায়। ফলে এই ধরনের আগ্নেয়গিরি থেকে অসংখ্য শক্ত পাথরের চাঁই ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া লাভার সঙ্গে সঙ্গে কালবৈশাখীর কালো মেঘের মতো প্রচুর গ্যাসও বেরিয়ে আসে। যদিও এই গ্যাস থেকে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির মতো আগুন ধরে যায় না।

যে ভলকানো আগ্নেয়গিরির নামে এই জাতীয় আগ্নেয়গিরির নাম, সেই আগ্নেয়গিরিতে কিন্তু শেষ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল ১৮৮৮-১৮৯০ সালে। সুতরাং অনেকের মতে ভালকানো জাতের আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের উদাহরণ ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যেই লক্ষ করা যেতে পারে। কারণ এই দু'টি আগ্নেয়গিরির প্রকৃতি অনেকটা একই ধরনের। তবু বেশিরভাগ ভূবিজ্ঞানীই ভিসুভিয়াস জাতীয় আগ্নেয়গিরিকে আলাদা জাত বলেই স্বীকার করেছেন।

ভিসুভিয়ান জাতীয় (Vesuvian type)

এই জাতীয় আগ্নেয়গিরির উদাহরণ সিসিলির এটনা, (৩৩০০ মিটার উঁচু), নেপলস শহরের অদূরে ভিসুভিয়াস (১১৮৬ মিটার উঁচু) এবং রাশিয়ার কামচাটকা অঞ্চলের কয়েকটি আগ্নেয়গিরি। এই জাতের আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণে লাভা, গ্যাস, ছাই, পাথরের টুকরো। অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বালামুখের মধ্যে শক্ত নিরেট লাভার স্তর গড়ে ওঠে। তার ঠিক নিচেই জমতে থাকে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস, যা বেরিয়ে আসবার জন্য পথ খুঁজতে থাকে। এই জমে থাকা গ্যাসের প্রচণ্ড চাপে শক্ত লাভার ঢাকনা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। শুরু হয় অগ্ন্যুৎপাত। অগ্ন্যুৎপাতের প্রথম পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস, জলীয় বাষ্প ও ছাই বেরিয়ে এসে আকাশের কয়েক কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে। ক্রমে গ্যাস, বাষ্প ও ছাইয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে ও শুরু হয় পাথর উৎক্ষেপন। পাথর-বৃষ্টি কমে এলে আরম্ভ হয় গলন্ত লাভার উদগীরণ। জ্বালামুখ উপছে পড়ে আগ্নেয়গিরির ঢাল বেয়ে তরল লাভা চলে যায় অনেকটা দূরত্ব। সেই তরল বিধ্বংসী লাভার নিচে চাপা পড়ে যায় সবকিছু, ধ্বংস নেমে আসে চারিদিকে। এভাবে সেই প্রাচীনকালে (৭৯ খৃষ্টাব্দে) ভিসুভিয়াসের লাভার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল

অতীতের সেই সমৃদ্ধ নগরী পমপেই ও হারকুলেনিয়াম। অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির ঢাল ভর্তি হয়ে যায় ছাই, ল্যাপিলি, আগ্নেয়-বোমা ও লাভায়। লাভা উদগীরণের পর ধীরে ধীরে অগ্ন্যুৎপাত কমে আসে, থেমে যায়। চারিদিক আবার শান্ত। কিন্তু কত বছরের জন্য কে জানে!

বন্দইসান জাতীয় (Bandaisan type)

এর নামকরণ জাপানের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি থেকে। এ ধরণের আগ্নেয়গিরিতে বেশ কয়েকটি বড় বিস্ফোরণ ঘটে। যার ফলে জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসে পাথরের ছোট বড় চাঁই। কিন্তু এ ধরণের আগ্নেয়গিরি থেকে গলিত লাভা বেরোয় না। বন্দইসান আগ্নেয়গিরি প্রায় এক হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকবার পর আবার সজীব হয়ে ওঠে ১৮৮৮ সালে।

এই ধরণের আর একটি আগ্নেয়গিরি ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অবস্থান ইন্দোনেশিয়া, জাভা ও সুমাত্রার মধ্যে। ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ ঘটে ১৮৮৩ সালে। এ দু'টি ছাড়া আর একটি এ ধরণের আগ্নেয়গিরি দেখা গেছে আলাসকার দক্ষিণ অঞ্চলে। নাম কাটমাই আগ্নেয়গিরি।

পিলি জাতীয় (Plean type)

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মারটিনেকে দ্বীপের মাউন্ট পিলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বোধহয় সবচেয়ে মেজাজী ও বিধ্বংসী। লাভার প্রকৃতি অত্যন্ত চটচটে হাওয়ায় খুব সহজেই বড় বড় শক্ত নিরেট পাথরের চাঁইতে পরিণত হয়। জ্বালামুখে লাভার নিচে প্রচুর গ্যাস জমলেও চটচটে লাভার জন্য সহজে বেরোতে পারে না। গ্যাসের চাপে জ্বালামুখ থেকে ধীরে ধীরে লাভা বেরোয়। পরে গ্যাসের চাপ প্রচণ্ড বেড়ে গেলে আচমকা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ

শুদ্ধ সমস্ত পাথর, শক্ত লাভা উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। এভাবে গলিত লাভা, শক্ত লাভার চাঁই ও প্রচুর ঘন কালো গ্যাসের ত্র্যহস্পর্শে ঘনিয়ে আসে সর্বনাশা প্রলয়ংকর বিভীষিকা। বিশাল আকারের পাথর, তরল লাভা আর গ্যাসের বন্যায় মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয় জনবহুল শহর ও রমণীয় নগরী।

১৯০২ সালের ২রা মে মাউন্ট পিলির প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হয়েছিল মারটিনেকের বাণিজ্য নগরী সেন্ট পিরি। এই রমণীয় শহরের ৩০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশেরই প্রাণান্ত হয় এই আগ্নেয়গিরির ধ্বংসলীলায়। যে ছাই এবং গ্যাস মণ্ট পিলি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার উত্তাপ ছিল ৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও গতিবেগ ছিল প্রতি সেকেণ্ডে ১৫০ মিটার। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জ্বালামুখ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উঁচু এক তীক্ষ্ণশীর্ষ এক আগ্নেয়শংকুর সৃষ্টি হয়েছিল।

আইসল্যাণ্ড জাতীয় (Icelandic type)

কেবলমাত্র হাওয়াই-জাতীয় আগ্নেয়গিরি ছাড়া পূর্বে আলোচিত আগ্নেয়গিরিগুলির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে একটি কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথে বা পাইপের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আইসল্যাণ্ড দ্বীপে অধিকাংশ আগ্নেয়-গিরির বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিস্তৃত ফাটলের মুখ দিয়ে লাভার উদ্গীরণে। দক্ষিণ ভারতের ডেকান ট্র্যাপের (Deccan trap) অগ্ন্যুচ্ছাস ভূ-পৃষ্ঠের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এভাবেই ঘটেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া নদী উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী স্নেক নদী উপত্যকার প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত স্থান ফাটল নিঃসৃত লাভায় ঢেকে গিয়েছিল। এই লাভার মোট বেধ ৩০০০ ফিটেরও বেশি। এছাড়া পৃথিবীর আরো যে সব অঞ্চলে এ ধরণের ব্যাসল্ট জাতীয় লাভার চাদর বা আস্তরণ দেখা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ আমেরিকার পারানা অঞ্চল ও মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার

বিস্তৃত অঞ্চল। এ ধরণের লাভা উদ্গীরণের আর এক নাম ফাটল-জাত অগ্ন্যুৎপাত (**fissure eruption**)।

এছাড়াও আগ্নেয়গিরিকে অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃতি ও ভয়াবহতার ওপর ভিত্তি করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) বিধ্বংসী (**explosive**) (২) মধ্যম প্রকৃতির (**intermediate**) (৩) শান্ত (**quiet**)। নাম শুনেই বোঝা যায়, বিধ্বংসী প্রকৃতির আগ্নেয়গিরি বেশ মেজাজী প্রকৃতির। এ ধরণের আগ্নেয়গিরি থেকে মূলত আগ্নেয় বোমা (**volcanic bomb**), পাথরের চাঁই উৎক্ষিপ্ত হয়। উদাহরণ, ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়গিরি। শান্ত প্রকৃতির আগ্নেয়গিরি মূলত লাভা উদ্গীরণ করে। ছাই বা পাথরের টুকরো নেই বললেই চলে। এ ধরণের আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে এসে গম্বুজাকৃতি ধারণ করে। উদাহরণ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি। আর মধ্যম প্রকৃতির আগ্নেয়গিরির মেজাজ যে এদের মাঝামাঝি তা বোধহয় বলার দরকার পড়ে না। এ ধরণের আগ্নেয়গিরিতে প্রথম পর্যায়ে কিছু কিছু পাথরের টুকরো ছাই ইত্যাদি বেরিয়ে আসে। কিন্তু তা অল্প সময়ের জন্যই। শেষ পর্যায়ে পাথরের টুকরো উৎক্ষেপণ বন্ধ হয়ে শুরু হয় লাভার উদ্গারণ। পৃথিবীর অধিকাংশ আগ্নেয়গিরিই এই জাতের মধ্যে পড়ে।

৪

অতীতের আগ্নেয়গিরির বিবরণ

অতীতের আগ্নেয়গিরির কথা বলতে প্রথমেই মনে পড়ে যায় ভিসুভিয়াসের কথা। এই সেই ভিসুভিয়াস যার লাভা আর ছাই বৃষ্টি ডুবিয়ে দিয়েছিল পমপেই আর হারকুলেনিয়ামের মতো সুন্দর

শহর দু'টিকে। পমপেই নগরীর ধ্বংসের কথাই বেদনার জলে লেখা আছে লর্ড লিটনের 'লাস্ট ডেজ অফ পমপেই' উপন্যাসে।

মধ্য ইতালিতে নেপলস উপসাগরের তীরে অবস্থিত মাউন্ট ভিসুভিয়াস বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত আগ্নেয়গিরি। এর অবস্থান ইউরোপের এমন এক স্থানে, যেখানে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আটশো বছর আগেই গ্রীক উপনিবেশের পত্তন হয়। তাই ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের কোন ঘটনাই অলিখিত থাকেনি, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও তা' সমৃদ্ধ। ১৮৪৫ সালে আগ্নেয়গিরির পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় এখানে।

ইউরোপের মধ্যে ইতালি চিরকালই পর্যটকদের মধুর পক্ষপাত পেয়ে এসেছে মূলত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। এবং এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনেকখানির দাবিদার ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি। বিধ্বংসী আগ্নেয়গিরি হলে হবে কি, ফিরোজা নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রের পটভূমিকায় মাউন্ট ভিসুভিয়াস এক কথায় অনবদ্য।

তবে এই অঞ্চলে ভিসুভিয়াস একমাত্র আগ্নেয়গিরি নয়। ভিসুভিয়াস ও আরো অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি সারিবদ্ধ হয়ে ইতালির পশ্চিমতটের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এর বিস্তৃতি নেপলস থেকে শুরু করে রোম ছাড়িয়ে ভিয়েনা পর্যন্ত। তবে আগ্নেয়গিরির দাপট মূলত নেপলস অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। নেপলসের পাঁচ মাইল পশ্চিমে ফ্লেগ্রিয়ান ফিল্ডস অঞ্চলে অনেকগুলি জ্বালামুখ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯টি জ্বালামুখ সমন্বিত এই অঞ্চলটির আয়তন মাত্র ২৫ বর্গ-মাইল। কিন্তু সুদূর অতীতে অন্তত ১০ হাজার বছরেরও আগে এই অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। তখনো ভিসুভিয়াস অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে নি। সে যাই হোক, ফ্লেগ্রিয়ান ফিল্ডস জায়গাটির প্রাকৃতিক গঠন মনে করিয়ে অতি পুরাতন প্রাচীন এক পৃথিবীকে। হয়তো তাই এই অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বহু প্রাচীন গল্পগাঁথা, রোমান কবিদের সুরেলা কবিতা। এখানে এমন একটি আগ্নেয়গিরি রয়েছে যার মুখ

থেকে আজো প্রতিনিয়ত বেরচ্ছে গন্ধকের গ্যাস। অনেকে মনে করেন এই গন্ধক নির্যাসবাহী আগ্নেয়গিরিকে দেখেই দান্তের কবিমানস ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার বিখ্যাত কাব্য 'ইনফারনো' (Inferno)।

বিখ্যাত রোমান কবি ভারজিল (৭০ খ্রীঃ পূ-১৯ খ্রীঃ) তার শেষ জীবন কাটিয়েছেন নেপলসে এবং পরিচিত হয়েছেন ফ্লেগ্রিয়ান অঞ্চলের সঙ্গে। তার বিখ্যাত কবিতা 'এনিড'এ এই অঞ্চলের জ্বালামুখে হ্রদের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে স্বাভাবিক কারণেই।

সুদূর অতীতে ভিসুভিয়াস ছিল নীল সমুদ্রের নিচে। পরে দ্বীপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরপর অনেকগুলি অগ্ন্যুৎপাত ও লাভা উদ্গীরণের ফলে ক্রমে এটি ইতালির মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ভূবিজ্ঞানীদের ধারণা, আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও এই অগ্ন্যুৎপাতের কোন লিখিত বিবরণ নেই, ভূতাত্ত্বিক লক্ষণ থেকে এই অগ্ন্যুৎপাতের বয়স হিসেব করা হয়েছে। প্রথম যে অগ্ন্যুৎপাতের লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে তার সময়কাল ৭৯ খৃঃ।

৭৯ খৃষ্টাব্দে অগ্ন্যুৎপাতের আগে ভিসুভিয়াসে ভূমিকম্প হয় ৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি। এই ভূমিকম্পে পমপেই, হারকুলেনিয়াম ও নেপলস শহরের অনেক ক্ষতি হয়। পমপেই শহরের আইসিস মন্দির এতটাই ভেঙ্গে পড়ে, যে একে অবার নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। এই ভূমিকম্প পরবর্তী ১৬ বছর ধরে প্রায়ই অনভূত হতো এবং শেষ পর্যায়ে ৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াসের প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতে ভিসুভিয়াসের পুরনো জ্বালামুখের অর্দ্ধেকটাই উড়ে যায়, তৈরি হয় নতুন জ্বালামুখ। পুরনো জ্বালামুখের বর্তমান নাম মাউন্ট সোম্মা। ভিসুভিয়াসের লাভায় তৎকালীন শহর পমপেই ও হারকুলেনিয়াম শহরের সঙ্গে সঙ্গে স্টাবিয়া শহরটিও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বড়

প্লিনি লাভার তলায় চাপা পড়ে বড় করুণভাবে মারা যান। তিনি বাস করতেন স্টাবিয়া শহরে। ভিসভিয়াসের এই প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় বড় প্লিনির ভাইপো ছোট প্লিনির অমূল্য পত্রাবলীতে। এই চিঠিগুলি তিনি লিখেছেন তাঁর ঐতিহাসিক বন্ধু ট্যাসিটাসকে। বাবা মারা যাওয়ায় ছোট প্লিনি মানুষ হন তার কাকা বড় প্লিনির কাছে। বড় প্লিনি ছিলেন নামকরা ঐতিহাসিক ও তৎকালীন রোমান সম্রাট নীরোর বন্ধু। সে যাই হোক, বড় প্লিনি আগ্নেয়গিরির লাভায় মারা গেলে তার মৃত্যুর বিবরণ জানতে চেয়ে তৎকালীন এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস চিঠি লেখেন ছোট প্লিনির কাছে। যেহেতু সে সময় বড় প্লিনি ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তাই ট্যাসিটাসের আগ্রহ যতটা ছিল বড় প্লিনির মৃত্যুর বিষয়ে, ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ব্যাপারে ততটা নয়। কিন্তু ছোট প্লিনির চিঠির মধ্যে থেকে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের এক অসামান্য প্রত্যক্ষ দলিল। প্রসঙ্গত, ছোট প্লিনির চিঠি থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি।

'সেই সময় বড় প্লিনি ছিলেন মিসেনাম শহরে। তার অধীনে তখন নৌবাহিনী। ৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অগষ্ট আমার (ছোট প্লিনির) মা তাঁকে আকাশে বিশাল আকারের মেঘ দেখাবার জন্য ডাকলেন। কিছুক্ষণ আগে বাইরে থেকে ফিরে চান খাওয়া দাওয়া সেরে পড়াশোনা করছিলেন। মায়ের কথায় বইপত্তর ছেড়ে তক্ষুণি তিনি বাড়ির বাইরে এলেন। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ভালো করে মেঘের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন দূরের পাহাড়ের মাথা থেকে বিশাল আকারের মেঘ বেরিয়ে এসে ওপরে আকাশে উঠে যাচ্ছে। সেই মেঘের আকৃতি অনেকটা দীর্ঘ পাইন গাছের মতো, যা আকাশে উঠে চারিদিকে তার ডালপালা মেলে দিচ্ছিল। আর সেই মেঘ ক্রমেই আকারে এবং আয়তনে বেড়ে যাচ্ছিল। মেঘের রং কখনো উজ্জ্বল, কখনো বা কালো, মনে হচ্ছিল যেন মেঘের সঙ্গে মিশে

রয়েছে পাথরের টুকরো আর ছাই। আমার কাকার মতো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি সব কিছুই বুঝতে পারছিলেন, না বোঝার কোন কারণ ছিল না।

তিনি তক্ষুণি কর্মচারীদের আদেশ দিলেন জাহাজ ঠিক করতে। তিনি বেরোবেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বাসাসের স্ত্রী রেকটিনার কাছ থেকে চিঠি পেলেন। ভিসুভিয়াসের নিচেই ওঁর বাড়ি। তাই ওঁকে ওখান থেকে উদ্ধার করবার কথা লিখে উদ্বিগ্ন-চিত্তে সাহায্য চেয়েছেন। রেকটিনার চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আগের পরিকল্পনা বদলে ঠিক করলেন ভিসুভিয়াসের কবল থেকে রেকটিনাকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি যাবেন। যদি সম্ভব হয় সমুদ্রতীরের অন্যান্য শহর থেকেও আটক ব্যক্তিদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করবেন। জাহাজ নিয়ে সমুদ্রতীরের এত কাছাকাছি তিনি নোঙ্গর করেছিলেন যে তা' ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের বিপদ সীমানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ওসব জায়গা থেকে সব লোকজন পালিয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু বিপদের এত মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বড় প্লিনি ছিলেন নির্ভীক ও শান্ত। কোন রকম ভয় বা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করতে পারে নি।

তিনি ভিসুভিয়াসের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন যে ওর কাছে পাহাড় থেকে গরম ছাই, সিনডার উড়ে এসে পড়ছিল। তাছাড়া এ সময় অদ্ভুতভাবে সমুদ্র পিছিয়ে যাচ্ছিল। ফলে বড় প্লিনির জাহাজ ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। জাহাজের নাবিকরা তাকে বোঝাচ্ছিলেন, এ সময় পালাতে না পারলে খুবই বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভীক, বিপদ দেখে তিনি কখনো পালাতে শেখেন নি।

তিনি জাহাজ নিয়ে ষ্টাবিয়াতে হাজির হলেন। পমপোনিয়াসকে উদ্ধার করলেন। কাকাকে এ সময় খুব আনন্দিত মনে হচ্ছিল। এরপর তিনি চান করে খেতে বসলেন।

এ সময় ভিসুভিয়াসের জ্বালামুখ থেকে আগুনের বিশাল শিখা বেরোচ্ছিল। অন্ধকার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তা' আরো ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দূরে পরিত্যক্ত গ্রামগুলো যেন সেই আগুনে পুড়ছে। ক্রমে আগুনের ভয়াবহতা যখন বাড়তে লাগল, তিনি কামপোনিয়াস ও অন্য লোকজনদের নিয়ে জাহাজে ফিরে আসবার জন্য বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরোলেন। জ্বলন্ত পাথরের টুকরোর ভয়ে ওরা সবাই বালিশ বেঁধে নিয়েছিলেন মাথায়। কিন্তু বাড়ি থেকে এভাবে জাহাজে আসবার পথে হঠাৎ পড়ে যান মাটিতে। আহত বিস্ময়ে সবাই দেখল, বড় প্লিনির দেহে আর প্রাণ নেই।

ছোট প্লিনির চিঠির মধ্যে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের সজীব বিবরণ থাকলেও পমপেই ও হারকুলেনিয়াম শহর দু'টির ধ্বংসের কোন উল্লেখ নেই। পমপেই ও হারকুলেনিয়ামের ধ্বংসের প্রথম সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় ভি মারশালের লেখায় ঘটনার প্রায় ১২ বছর পরে। আরো প্রায় ১৫০ বছর পরে ২৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ডিয়ন ক্যাসিয়াম এই ধ্বংসলীলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা করেন মূলত লোক পরম্পরায় শোনা কাহিনীর ওপর নির্ভর করে। এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই এডওয়ার্ড-বুলওয়ার লিটন (লর্ড লিটন) রচনা করেন তাঁর অনবদ্য উপন্যাস 'দ্য লাস্ট ডেজ অফ পমপেই', যে কথা আগেই বলা হয়েছে।

সে যুগে পমপেই ছিল এক সমৃদ্ধ রোমান শিল্প নগরী, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। জনসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। এমন একটি শহর ভিসুভিয়াসের বিশ-পঁচিশ ফুট পুরু লাভা, পাথরের টুকরো আর ছাইয়ের তলায় মর্মান্তিকভাবে চাপা পড়ে যায়। পমপেই শহরের প্রায় অর্ধেক অঞ্চল খুঁড়ে পুরনো ধ্বংসবশেষের মধ্যে দু' হাজার কংকাল পাওয়া গেছে। এদের শুয়ে থাকার ধরণ থেকে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দমবন্ধ হয়ে এদের মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ মাথায় ছাদ ভেঙ্গেও মৃত্যু বরণ করেছে। লাভা ও

ছাইয়ের স্তরের মধ্যে একটি মৃত মানুষের কংকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। যার হাতের মুঠিতে ধরা ব্যাগে ছিল ৩৬০টি রূপোর মুদ্রা, ৪২টি ব্রোঞ্জ মুদ্রা ও ৮টি সোনার মুদ্রা। এই আবিষ্কার থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না, বহু মানুষ তাদের সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু গরম ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে তাঁদের আশা-আকাংখা, জীবন-সবকিছুর জীবন্ত কবর রচিত হয়েছে।

অন্যদিকে হারকুলেনিয়াম শহর ভিসুভিয়াসের কাছাকাছি হলেও ছাই কিংবা লাভাস্রোতের নিচে চাপা পড়ে নি। শহরটি চাপা পড়েছে গলিত আগ্নেয় কাদার (**mudflow**) নিচে, যা কোথাও কোথাও ৬০-৬৫ ফিট পুরু। তবে এই কাদার সঙ্গে মিশে রয়েছে ছাই, পাথরের টুকরো ও লাভা। এই গলিত কাদা ঠাণ্ডা হয়ে তৈরি হয়েছে শক্ত টুফ পাথর।

পমপেই ও হারকুলেনিয়াম শহরের জন্য খনন শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। পমপেই শহরের প্রথম শ্বেত মর্মর মূর্তিটি পাওয়া যায় ১৭৬৩ সালে। কিন্তু তা' অন্য এক প্রসঙ্গ।

৭৯ সালের পর ভিসুভিয়াস থেকে তেমন বিশেষ অগ্ন্যুৎপাত হয় নি। প্রায় এক হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকবার পর আবার জেগে ওঠে ১০৪৯ সালে। তারপর আবার ১১৩৮, ১১৩৯ ও ১৬৩১ সালে। ১৬৩১ সালের (ডিসেম্বর ১৬) অগ্ন্যুৎপাত খুবই বিধ্বংসী প্রকৃতির ছিল। ভিসুভিয়াসের লাভাস্রোতে জর্জিয়ো এ ক্রেমানো, পরটিসি, পুগলিয়ানো, লা স্কালা এবং টার ডেল গ্রেকোর পশ্চিম অঞ্চল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে আবার অগ্ন্যুৎপাত হয় ১৭৬৭, ১৭৭৯, ১৭৯৩, ১৮২২, ১৮৩৮, ১৮৫০, ১৮৭২, ১৮৭৭, ১৮৮১, ১৮৯৩ ও ১৮৯৮ সালে। বিশ শতকেও অনেকবার মাউন্ট ভিসুভিয়াস থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে। এদের মধ্যে ১৯০৬ ও ১৯৪৪ সালের অগ্ন্যুৎপাত উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে ভালকানো খুবই উল্লেখযোগ্য। সত্যি বলতে কি, অগ্ন্যুৎপাতের দিক থেকে ভালকানোর ইতিহাস ভিসুভিয়াসের চেয়েও পুরনো। প্রাচীন কাহিনীতে ভালকানো আগ্নেয়গিরি রোমান অগ্নিদেবতা ভালকানের কামারশালা। দেবতাদের কামার ভালকান এই কামারশালাতেই নাকি তৈরি করেছেন হারকিউলিসের বক্ষ আবরণ, একিলিসের ঢাল, অ্যাপোলো ও ডায়নার তীর। কাহিনী অনুসারে আগ্নেয়গিরি থেকে যে আগুন ও গ্যাস বেরিয়ে আসে তার উৎস নাকি ভালকানের ঐ কামারশালা।

ভালকানো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের প্রচণ্ডতা ষ্ট্রমবলি কিংবা সিসিলি দ্বীপের এটনার চেয়েও বেশি। বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিসটটল (মৃত্যু ৩২২ খৃঃ পূঃ) ভালকানো আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ডতা দেখেছেন এবং লিখে গেছেন কীভাবে লিপারি নগর আগ্নেয়ভস্ম ও ছাইয়ে ঢেকে গিয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ঐতিহাসিক ক্যালিয়াস দেখেছেন ভালকানোর দু'টি জ্বালামুখ। একটি জ্বালামুখ থেকে প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে বহু আকারের পাথরও উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। গর্জন এত প্রচণ্ড, যে ৫০ মাইল দূর থেকেও তা' শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। হোমারের 'ওডিসি'তে ইথিকার রাজা ওডিসিয়ূস ট্রয়ের পতন ও ট্রোজান যুদ্ধের পর খুব সম্ভবত ভালকানো আগ্নেয়গিরি অঞ্চল হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ৬৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে লেখা 'ওডিসি' পড়লে সেকথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে (১৮২ খৃঃ পূ) ভালকানোর কাছেই সমুদ্র ফুঁড়ে আর একটি আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়; যা পরে ভালকানোর সঙ্গেই মিলেমিশে এক হয়ে যায়। পরবর্তী অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ১২৬ খৃঃ পূ এবং ৯১ খৃষ্টপূর্বাব্দে। এর পরের অগ্ন্যুৎপাতের সময় ঠিকঠাক মতো জানতে পারা যায় না। তবে ৭০১ থেকে ৭৮৬ সালের মধ্যে কোন সময়ে যে ভালকানো আগ্নেয়গিরি আবার সজীব তার লিখিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পরবর্তীকালে ১৪৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ভালকানো আগ্নেয়গিরিতে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা সমস্ত সিসিলি দ্বীপকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, এমন কি সুদূর নেপলস শহর থেকেও এর তীব্রতা অনুভব করা গিয়েছিল। অনেকে বলেছেন, এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দ্বীপের আশেপাশের সমুদ্র প্রায় 'ফুটন্ত' অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। প্রচুর পাথরের চাঁই, লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়ে সমুদ্রে জমা পড়েছিল। এর প্রায় ৬০ বছর পরে স্পালানজানিতে গিয়ে দেখেছেন, ভালকানোর দু'টো জ্বালামুখের মধ্যে একটি পড়ে আছে, আর একটি যে কখন কীভাবে ধ্বংস হয়েছে, তা কেউই সঠিক বলতে পারেন নি। ১৭৩০ থেকে ১৭৪০ সালের ভেতরে ভালকানো প্রায় সব সময়েই সক্রিয় সজীব ছিল। ১৭৭১ ও ১৭৭৫ সালে আবার অগ্ন্যুৎপাত হয় ভালকানো আগ্নেয়গিরি থেকে। তবে এরপর ১৭৮৬ সালে যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তা ছিল অত্যন্ত বিধ্বংসী প্রকৃতির। জ্বালামুখ থেকে ১৫ দিন ধরে শুধু যে জ্বলন্ত আগ্নেয়ভস্ম ও পাথরের টুকরো উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, তাই নয়, বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ চারিদিক আলোড়িত করে রেখেছিল। এই বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতের ভালকানো প্রায় একশো বছর ঘুমিয়ে ছিল। এর ঘুম ভাঙ্গার খবর আবার পাওয়া যায় ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে এবং ১৮৮৮ সালের আগস্টে। ১৮৮৮ সালের অগ্ন্যুৎপাত প্রায় দু'বছর ধরে চলে। এ সময় ভালকানোর জ্বালামুখ থেকে পাথরের টুকরো ও সাদা ছাই উৎক্ষিপ্ত হয়। এই ছাইয়ের রং নাকি এত সাদা ছিল, যে তা' বরফ বলে ভুল হতে পারে। এই বিস্ফোরণে ছ' মাইল দূরের লিপারি শহরের বাড়িঘরের জানলা পর্যন্ত ভেঙ্গে গিয়েছিল। সিসিলি থেকে লিপারি পর্যন্ত প্রসারিত সমুদ্রের নিচের মোটা তার (cabl.) পাঁচবার ভেঙ্গে গিয়েছিল। ১৮৮৮-৯০ সালের আগ্নেয় বিস্ফোরণের পর ভালকানো আগ্নেয়গিরি খুবই নির্জীব হয়ে পড়ে এবং জ্বালামুখ থেকে কিছু গন্ধক বাহী গ্যাস বেরতো মাঝে মাঝে।

ভালকানো আগ্নেয়গিরি থেকে যে গ্যাস বেরোতো তার একটি হিসেবে পাওয়া গেছে ১৯৪০ সালে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড	৫৫	৬৯%
সালফার ডাই-অক্সাইড	৬	২১%
হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস	১·৫	১৭%
নাইট্রোজেন	১·৯	২·৭%

গ্যাসের তাপমাত্রা ৯৯ থেকে ৪৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। অতীতে ভালকানো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে কিছু পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যেত। উনবিংশ শতকে একটি রাসায়নিক কারখানাও স্থাপিত হয় জ্বালামুখের কাছাকাছি। কিন্তু ১৮৭৩ সালে অগ্ন্যুৎপাতে কারখানাটি ধ্বংস হয়ে যায়।

ভিসুভিয়াস ও ভালকানোর মতো স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরিও আগ্নেয়-গিরির জগতে খুবই উঁচু ঘরাণার। এর অগ্ন্যুৎপাতের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এর অবস্থান ও অন্যান্য কিছু কিছু আনুষঙ্গিক আগেই বলা হয়েছে। স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির অতীত দিনের ইতিহাস জানতে পারা যায় অ্যারিস্টটল, ডিয়োডোরাস সিকুলাস, স্ট্র্যাবোর বিবরণ থেকে। ভাবলে অবাক হতে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি স্ট্রমবলি সম্পর্কে যে কথা লিখে রেখে গিয়েছেন স্ট্রমবলি সম্পর্কে যে সব কথা লিখেছিলেন, তা আজো প্রযোজ্য। এর প্রাচীন নাম স্ট্রংগাইল, যার অর্থ বৃত্তাকার। এই নামটি এখনো এই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষজন ব্যবহার করে থাকেন। বিখ্যাত ইত্যালীয়ান আগ্নেয়গিরিবিদ স্প্যালানজানি ১৭৮৮ সালে স্ট্রমবলি পরিদর্শন করে তার বিবরণ দিয়েছেন। সেই বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলো নিচে।

'জ্বালামুখের পশ্চিমভাগের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাষ্প বেরোচ্ছিল। সেই ছিদ্রপথের দু'পাশে হলুদ গন্ধকের আস্তরণ। পূর্বদিকের একটি বড় ছিদ্র দিয়ে প্রচুর বাষ্প বেরিয়ে আসছিল। সেই

বাষ্প-স্তম্ভের ব্যাস প্রায় ১২ ফিট। জ্বালামুখের কেন্দ্রে ফানেলের মতো বড় গর্ত, তার মধ্যে তরল লাভা টগবগ করে ফুটছিল। সেই লাভার মধ্যে অসংখ্য বুদবুদ। মাঝে মাঝে বিকট শব্দে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পাথরের টুকরো উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল আকাশে।

স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই সাদা গ্যাস ও লাভা উদগীরণের খবর পাওয়া গেলেও তা' তেমন বিধ্বংসী প্রকৃতির নয়। তবে ১৯৩০ সালে স্ট্রমবলি থেকে যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, তার প্রকৃতি সত্যিই বিধ্বংসী ছিল। এতে বেশ কিছু মানুষজন মারা যান ও প্রচুর ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়। স্ট্রমবলির ২৫০০ বছরের ইতিহাসে এরকম বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতের সংখ্যা তেমন বেশি নয়।

বিখ্যাত আমেরিকান আগ্নেয়গিরিবিদ ফ্রেড বুলার্ড ১৯৫২ সালে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরি দেখতে গিয়েছিলেন। স্ট্রমবলি পরিদর্শনের যে অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেন, তা' সত্যিই খুব চিত্তাকর্ষক। সেই বিবরণের প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো।

'আমি তিনবার স্ট্রমবলি গিয়েছি। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নেপলস থেকে প্রথমবার রওনা হই ১৯৫২ সালের ২০শে জুন। স্টিমার থেকে পরদিন ভোরে দিগন্তে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির সবুজ রেখা দেখতে পেলাম। কিন্তু জ্বালামুখে কোন আগুনের আভাস নেই। শুধু চোখে পড়ল জ্বালামুখ থেকে দুধের মতো সাদা বাষ্প বেরিয়ে আসছে। শুধু মাঝে মাঝে তারই সঙ্গে হলুদ বাদামী গ্যাসের মিশেল। আমাদের স্টিমার স্ট্রমবলির কাছাকাছি পৌঁছলে চোখে পড়ল পাহাড়ের ঢালে ক্ষত চিহ্নের মতো স্কিয়ারা দেল ফুয়োকো জ্বালামুখ, যা আসলে মূল জ্বালামুখের পূর্ব অংশ। বুঝতে পারছিলাম পাহাড়ের এই ঢাল বেয়েই তরল লাভা গড়িয়ে পড়ে সমুদ্রে। এই অংশটি চওড়ায় প্রায় এক কিলোমিটার।

'স্ট্রমবলিতে কোন জেটি নেই, তাই আমাদের স্টিমার তীর থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তীর থেকে দু'তিনটে ছোট নৌকো

এসে আমাদের মতো যাত্রীদের পৌঁছে দিল তীরে। স্ট্রমবলির পূর্বে সান ভিনসেনজো গ্রামের কাছে আমাদের নৌকো ভিড়ল। নৌকো তীরে পৌঁছনো মাত্র কয়েকটি ছোট ছেলে ছুটে এলো। তারপর ওদের হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের মালপত্র ধরে কী টানাটানি!

'স্ট্রমবলিতে কোন গাড়ি নেই, বিদ্যুৎ নেই, রেডিয়ো নেই, মালপত্র বওয়ার জন্য গাধা নেই, এমন কি একটা কুকুরও চোখে পড়ল না। আমাদের মালপত্র ছেলেদের মাথায়। ওদের পেছন পেছন আমরা অসংখ্য লাভার টুকরো ছড়ানো বেলাভূমির উপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছলাম হোটেলে। লোকানডো মিরামেয়ার হোটেল লাভা পাথর দিয়ে তৈরি। এমন কি ছাদটিও একই পাথরে তৈরি। এই ঘরগুলো বেশ ঠাণ্ডা। স্ট্রমবলিতে কোন পানীয় জলের উৎস নেই। একমাত্র ভরসা বৃষ্টির জল। তাই লোকে জমিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে খরচ করে।

'পরদিন ভোর চারটের সময় আমরা ইতালীয়ান গাইড সিনর সালভাতোর দি লোসকে নিয়ে স্ট্রমবলির চূড়ায় চড়ব বলে রওনা হলাম। তখন সবে ভোরের আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে। আমার গাইডের পায়ে কোন জুতো ছিল না। ওর কাঁধের ঝোলায় আমার (মুভি, রঙিন ও কালো-সাদা), নোটবুক, জল ও দুপুরের লাঞ্চ প্যাকেট। লাভার টুকরো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ল, গ্রামের আরো অনেক বাড়ি—সবই লাভা-পাথর দিয়ে গড়া। প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ হাঁটবার পর পৌঁছলাম পরিত্যক্ত আগ্নেয়গিরি পরিদর্শন কেন্দ্রে। ১৯৩০ সালের অগ্ন্যুৎপাতে এটি ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর থেকে পাহাড়ের ঢাল খুব চড়া। প্রায় তিনঘণ্টা হাঁটবার পর পরিশ্রান্ত শরীরে উত্তরের চূড়ায় পৌঁছলাম। এখান থেকে জ্বালামুখের ভেতরে উঁকি দিলাম। বিরাট ডিমের মতো আকৃতি, বৃহত্তম ব্যাস প্রায় ১০০০ ফিট। জ্বালামুখের তলদেশ এতই গভীর যে ওপর থেকে ভালো মতো ঠাহর হয় না। জাহাজের চোঙ্গা থেকে

যেমন বাষ্প বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনিভাবে ছ'টি গর্ত থেকে প্রচুর গ্যাস বা বাষ্প বেরিয়ে আসছে। একটি গর্ত থেকে নিঃশব্দে গ্যাস বেরোচ্ছিল, আর একটি থেকে বাষ্প বেরোবার সময় বাষ্পীয় শক্ট বা রেল ইঞ্জিনের মতো আওয়াজ হচ্ছিল। জ্বালামুখের তলদেশ ও ধারের দেওয়ালে গন্ধকের আস্তরণ।

'প্রায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত থেকে জ্বালামুখের ভেতরের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করছিলাম। ভেতরে কোন তরল লাভা দেখতে না পেয়ে স্বভাবতই মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ থেকে সর্টকাট রাস্তা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম।

'দ্বিতীয় বার স্ট্রমবলিতে এলাম ডিসেম্বরে। কিন্তু কেবলমাত্র স্ট্রমবলির মাথায় আগুনের মতো লাল হলকা দেখতে পেলাম। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই স্ট্রমবলিতে এলাম শেষ বারের মতো। সেবারও আমার গাইড সালভাদোরকে নিয়ে জ্বালামুখের কাছে হাজির হলাম। জ্বালামুখের দিকে তাকাতেই দেখি প্রচুর গ্যাস আর বাষ্প হু হু করে ওপরে উঠে আসছে। পায়ের কাছে মাটি পাথর খুঁড়ে দেখি, সমস্ত কিছু একেবারে তেতে আগুন হয়ে আছে। পরের দিন আবার ওখানে গিয়ে দেখি, জ্বালামুখ থেকে তপ্ত পাথরের টুকরো আকাশে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্রথমে বেশ ভয় পেয়ে গেলেও পরে মুভি ক্যামেরাতে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণের চলচ্চিত্র তুলতে পেরেছিলাম।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মারটিনেকে দ্বীপের মাউন্ট পিলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে সবচেয়ে মেজাজী ও বিধ্বংসী, সেকথা আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে। পিলি আগ্নেয়গিরি থেকে প্রথম অগ্ন্যুৎপাতের খবর পাওয়া যায় খুব সম্ভবত ১৬৪০ সালে। তখন অবশ্য এর নাম ছিল 'বল্ড মাউনটেন' বা ন্যাড়া পাহাড়। তখন ঐ পাহাড়ের শীর্ষে কোন জ্বালামুখ ছিল না। শুধু তাই নয়, দেখতে ছিল ঠিক ন্যাড়া মাথার মতো মসৃণ। পিলি নামটি খুব সম্ভবত এসেছে ফরাসী 'পিলি' শব্দ থেকে, যার অর্থ খোসা ছাড়ানো বা ন্যাড়া।

কারণ সেসময় ১৬৩৫ সাল থেকে ওখানে ফরাসী উপনিবেশ শুরু হয়। সে যাই হোক, নামকরণের আর একটি ভাষ হলো, হাওয়াই আগ্নেয়গিরির দেবী পিলি থেকেই এই নামকরণ।

১৯০২ সালের বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতের আগে আর মাত্র দু'বার আগ্নেয়চ্ছ্বাস দেখা গেছে। ১৭৯২ ও ১৮৫১ সালে। ১৮৫১ সালের অগ্ন্যুৎপাতে গুরু গম্ভীর গর্জন শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, তা ছাড়া উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল অনেকটা ছাই যা প্রায় সেণ্ট পিরি শহর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। অবশ্য অগ্ন্যুৎপাত চলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপর আবার সব ঠাণ্ডা। স্থানীয় অধিবাসীরা তাই তেমন বিব্রত বোধ করেন নি।

মাউণ্ট পিলি বৃত্তাকার শংকু আকৃতির। ওপরে একটিই শীর্ষবিন্দু। এই আগ্নেয়গিরি চারিপাশে ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। কেবলমাত্র দক্ষিণ পূর্বদিকে ঢালু হতে পারে নি, কারণ ওদিকে আরেকটি আগ্নেয়শংকু কারবেট পথ আটকে রয়েছে। মাউণ্ট পিলির ঢালে রয়েছে অনেকগুলি খাত, যা দিয়ে ওপরের বৃষ্টির জল নিচে নেমে যায়। এই খাতগুলি দিয়েই আগ্নেয়লাভা ও উত্তপ্ত তরল কাদা দ্রুত নেমে গিয়ে শহর গ্রাম ধ্বংস করেছিল।

১৯০২ সালে অগ্ন্যুৎপাতের আগে জ্বালামুখের আকার ছিল গোল কাটির মতো। এই আকার ছিল বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ১৯০২ সালের অগ্ন্যুৎপাতের পর এই আকার বদলে যায়। ১৯০২ সালে অগ্ন্যুৎপাতের বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে, তা প্রথম লক্ষ করেছিলেন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। ২রা এপ্রিল উনি লক্ষ্য করলেন আগ্নেয়গিরির ঢালে একটি ছিদ্র থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসছে। ২৩শে এপ্রিল সেণ্ট পিরি শহরে ছাই পড়ল, গন্ধকের গন্ধ সারা শহরে আর মৃদু ভূকম্পন অনুভব করা গেল শহরে। ২৫শে এপ্রিল জ্বালামুখে বিস্ফোরণ ঘটল, বাষ্প, ছাই, পাথরের টুকরো উড়লো আকাশে। ক্রমে ছাই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে শুরু করায় শহরের রাস্তাঘাট বন্ধ,

ব্যবসা বাণিজ্য অচল। তৎকালীন খবরের কাগজ (Les colonic) ৩রা মে তারিখের সংখ্যায় লিখল—

'ছাই বৃষ্টির আর বিরাম নেই। সকাল সাড়ে ন'টার সময়ও সূর্য নিস্তেজ নিষ্প্রভ। রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ বন্ধ। গাড়ির চাকা ছাইয়ে ডুবে গেছে দমকা বাতাস বাড়ির ছাদ থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আগ্নেয় ছাই। আর সে ছাই খোলা জানলা পথে ঢুকে পড়েছে বাড়ির অন্দর মহলে।'

সেণ্ট পিরি শহরের প্রচুর লোকজন আতংকে শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করল। কিন্তু বাইরের বহু লোকজন শহরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসায় শহরের লোকসংখ্যা বেশ কয়েক হাজার বেড়ে গেল। ফরাসী গভর্ণর কমিশন নিয়োগে জানতে চাইলেন আগ্নেয়গিরি থেকে বিপদ সত্যিসত্যিই কতখানি। কমিশন তাদের রিপোর্টে বললেন, আগ্নেয়গিরি থেকে তেমন কোন ভয় নেই, তাই শহর ত্যাগ করে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু শহরের অধিবাসীরা কমিশনের রিপোর্টকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখল। ওদের ধারণা হলো, আগামী ১০ই মে সাধারণ নির্বাচনের দিন পর্যন্ত শহরের লোককে আটকে রাখবার জন্য ভুল রিপোর্ট প্রচার করা হচ্ছে। তাই জনতাকে আশ্বস্ত করবার জন্য ফোর্ট দ্য ফ্রান্স থেকে সেণ্টপিরিতে এলেন গভর্ণর। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, আর ফিরিতে পারলেন না। মাউণ্ট পিলির অগ্ন্যুৎপাতে মারা গেলেন।

এই সময় শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। মাউণ্ট পিরিল দক্ষিণ-পশ্চিম ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে উপত্যকায় বন্যার সৃষ্টি করল। ৫ই মে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে-আসা তরল কাদাবালিতে নিচের চিনির কল ধ্বংস হয়ে গেল। প্রায় জনা পঞ্চাশেক কর্মীর সেই কাদার নিচে জীবন্ত সমাধি হলো। সেই কাদাজল হুড় হুড় নেমে গিয়ে সমুদ্রে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করল। সেই ঢেউয়ে দু'টি নৌকো উলটে গেল সমুদ্রে। এবং সেই বন্যা গিয়ে আঘাত করল সেণ্টপিরি শহরের নিচু অঞ্চলগুলিতে।

এদিকে মাউন্টপিরির জ্বালামুখে যে লেক ছিল তাতেও জল বাড়তে শুরু করল। কিন্তু রাস্তায় ছাই জমে বাঁধ সৃষ্টি হওয়ায় লেকের জল আরো অনেক বেড়ে গেল। এদিকে জ্বালামুখের ভেতরে অগ্ন্যুৎপাতের জন্য উত্তাপ বাড়তে শুরু হওয়ায় লেকের জলেরও উত্তাপ বাড়তে শুরু করল। পরে বিস্ফোরণের ফলে সেই ছাইয়ের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে লেকের সেই উত্তপ্ত কাদা জলরাশি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করে প্রচণ্ড বেগে। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে এর সঙ্গে প্রচুর বিরাট আকারের পাথর গাছপালা মিশে ভয়ংকর সর্বনাশা রূপ নেয়। এই কাদা আর পাথরের বন্যায় চিনির কল ও বেশ কিছু লোকজন মারা যায়, একথা আগেই বলা হয়েছে। শহরের অবস্থাও তখন অত্যন্ত ভয়াবহ। চারিদিকে লোকজন পালাচ্ছে। কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় কোথায়, কেউ জানে না। শহরের জীবনযাত্রা পুরোপুরি বিপর্যস্ত। কেউ কেউ পাহাড়ের দিকেই পালাচ্ছে। পরের দিন ৬ই মে আগ্নেয়গিরির রূপ আরো সক্রিয়। বহু মানুষ পায়ে হেঁটে অন্য শহরের দিকে যাত্রা শুরু করল। কেউ কেউ আবার স্টিমারে চেপে ফোর্ট দ্য ফ্রান্স অথবা কাছের সেন্ট লুসিয়া দ্বীপের দিকে যাত্রা শুরু করল। কিন্তু গভর্ণরের আদেশে সৈন্যদল পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দিল। স্থানীয় পত্রিকা লে কলোনিস (Les colonies) ঘোষণা করল মাউন্টপিলিকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু পরের ৭ই মে জ্বালামুখে আরো গ্যাস আর ছাই উৎক্ষিপ্ত হলো। পরের দিন ৮ই মে সকালবেলা ছিল পরিষ্কার, ঝকঝকে। সবাই ভাবল, বিপদ বোধহয় কেটে গেল। কিন্তু সেদিন রাত আটটা নাগাদ আগ্নেয়গিরিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। পরপর চারবার। কান তালা করে দেবার মতো শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে এলো ছাই আর বিশাল কালো মেঘের উত্তপ্ত কুণ্ডলী, সঙ্গে বিদ্যুতের চমক। মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই ছাই ভরা তপ্ত মেঘ সেন্টপিরি শহরকে ঢেকে ফেলল। নিহত হলো প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। অনেকের মতে,

সেই গ্যাস আর মেঘ এত উত্তপ্ত ছিল, যে সেই তাপেই দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল এতগুলো মানুষ। এই বিস্ফোরণে সেণ্টপিরির প্রত্যেকটি বাড়ির ছাদ উড়ে গিয়েছিল। সমস্ত গাছের পাতা ডালপালা সব নিমেষেই পুড়ে ছাই।

সেই সময় সেণ্টপিরি বন্দরের কাছাকাছি যত জাহাজ, স্টিমার ছিল, সবই ধ্বংস হয়েছে। কেবল দু'টি বাদে। রোরাইমা (Roraima) জাহাজের যে দুজন যাত্রী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল বারবাডোজের এক মহিলা নার্স ও তারই তত্ত্বধানে একটি ছোট মেয়ে।

এই অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে নার্সটি যে বিবরণ দিয়েছিল তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলো নিচে।

'দূর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচুর ধোঁয়া গ্যাস বেরোচ্ছে। ক্যাপটেন (যিনি পরে মারা যান) আমার কর্ত্রীকে বলেন, এখানে আমার একবিন্দু সময়ও নষ্ট করবার ইচ্ছে নেই। আমি আমার কেবিনে ফিরে গিয়ে বাচ্চাদের সকলের জলখাবারের জন্য বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় জাহাজের স্টুয়ার্ড (ইনিও পরে মারা যান) ছুটে এসে বলেন, শিগগির দরজা বন্ধ করুন—আগ্নেয়গিরি আসছে। ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করলাম; আর পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, শব্দে আমার কানের পরদা ফেটে যায় আর কি! ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনুভব করলাম, কে যেন আমাদের জাহাজ শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তার পরই আমরা শূন্য থেকে পড়তে শুরু করলাম। পড়ছি তো পড়ছিই। আমার কর্ত্রী তাঁর ছোট মেয়েটিকে কোলে আঁকড়ে রেখে দিয়েছেন, আর দু'টি মেয়েকে কোনরকমে দু'হাতে চেপে ধরেছি আমি। বিস্ফোরণের ধাক্কায় আমরাও গড়াগড়ি খাচ্ছি কেবিনের মেঝেতে। হঠাৎ আমাদের কেবিনের দরজা খুলে গেল। সেই খোলা দরজা দিয়ে গরম কাদা আর ছাই আমাদের শরীর ঢেকে ফেলল। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা।

আমার কর্ত্রী মারা গেলেন। মারা গেলেন আরো অনেকেই। যাত্রীদের মধ্যে শুধু আমরা দুজন কীভাবে যেন বেঁচে গেলাম।'

সেন্টপিরি ছিল মারটিনিকে দ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য নগরী। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত এই শহরটি এতই মনোরম যে অনেকে একে 'পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্যারিস' নামে ডাকত। কিন্তু মাউন্টপিলির অগ্ন্যুৎপাতের পর শহরের যা চেহারা হয়েছিল, তা কল্পনারও অতীত। যেন প্রাণহীন এক শ্মশান। শহরের কোন বাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল না। এলোমেলো কিছু ভাঙ্গা দেওয়াল মৃত্যুপুরীর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শহরের প্রায় ৮ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে এই ধ্বংসলীলা চলে। এই অঞ্চলের মাঝখানে ধ্বংসলীলা সবচেয়ে বেশি, ধারের দিকে কম। অনেকের ধারণা, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ নির্গত যে বিরাট প্রচণ্ড উত্তপ্ত মেঘকুণ্ডলী (প্রায় ১০০০-১২০০ ফিট উঁচু) মুহূর্তের মধ্যে সেন্টপিরি শহরকে ঢেকে ফেলেছিল, তার প্রভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে সমস্ত মানুষ মুহূর্তের মধ্যে মারা যান। তবে মৃত্যুর কারণ সঠিক বলা সম্ভব নয়, কারণ কোন মৃতদেহেরই 'অটোপসি' (**autopsy**) করা হয় নি। বিখ্যাত আগ্নেয়গিরিবিদ খ্যাকরয় এ ধরনের মেঘ কুণ্ডলী উদ্গীরণের নাম দিয়েছেন 'নুঁয়ে আরদেঁতে' (**nuées ardentes**) বা **glouring clouds**) বা জ্বলন্ত মেঘকুণ্ডলী।

মাউন্টপিলি থেকে ১৯০২ সালের পর আবার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় ১৯২৯ সালে, চলে প্রায় তিন বছর ধরে। এই অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃতি ১৯০২ সালের মতোই, তবে ধ্বংসলীলার পরিমাণ কিছুটা কম। ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেন্টপিরি শহর তখন আবার গড়ে উঠেছে, কিন্তু লোক-সংখ্যা মাত্র ১০০০। কিন্তু এবার কোন প্রাণহানি ঘটেনি, কারণ সময় মতো মানুষজন এখান থেকে অপসারিত হয়েছিল। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জ্বালামুখে বিরাট এক লাভা-গম্বুজের সৃষ্টি হয়েছে।

সিসিলি দ্বীপের মাউন্ট এটনা পৃথিবীর বড় আগ্নেয়গিরির মধ্যে

একটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১০,৬২৫ ফিট, পুরো ইউরোপের মধ্যে উচ্চতম। মূল জ্বালামুখ আকারে বিশাল, পরপর জমে ওঠা লাভায় এর আগ্নেয়শংকু তৈরি। তাছাড়া আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট জ্বালামুখ, যা আসলে মূল জ্বালামুখের সঙ্গে তলদেশে যুক্ত। মূল জ্বালামুখের ২০ মাইল দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে এরকম প্রায় ২০০টি ছোট জ্বালামুখ। এদের মধ্যে মাউন্ট রসির উচ্চতা পাদদেশ থেকে ৪৫০ ফিট, এবং জ্বালামুখের পরিধি ২ মাইল। এটি নিজের দাবীতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আগ্নেয়গিরি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মাউন্ট এটনা থেকে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। তাই মহাকবি হোমারের লেখায় ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মাউন্ট এটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকবি ভারজিল (৭০ খৃঃ পূ-১৯ খৃঃ) তাঁর 'এনিড' কবিতায় মাউন্ট এটনার অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ দেন। ঐতিহাসিক ডিয়োডোরাস সিকুলাসের বিবরণ থেকে জানা যায়, ৩৯৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে মাউন্ট এটনার ২৪ মাইল লম্বা ও ২ মাইল চওড়া লাভাস্রোতের দাপটে কার্থোজিয়ান সৈন্যবাহিনী ফিরে যায়। তবে ঐতিহাসিক বিবরণের অপ্রতুলতার জন্য মাউন্ট এটনার অগ্ন্যুৎপাতের সঠিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে ১১৬৯, ১৩২৯, ১৫৩৬ ও ১৬৬৯ সালে মাউন্ট এটনা থেকে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে। এর মধ্যে আবার ১৬৬৯ সালের অগ্ন্যুৎপাত ভয়াবহতার আগেকার সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এই অগ্ন্যুৎপাতে পুরনো জ্বালামুখে ভেঙ্গে উড়ে বেরিয়ে গেছে। ৬ কিলোমিটার লম্বা লাভাস্রোতে ধ্বংস হয়ে যায় কাটানিয়া শহর। এরপর ১৬৬৯ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে ৩৩ বার অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘ ৫১ বছর সুপ্ত থাকবার পর মাউন্ট এটনা থেকে আবার লাভা বেরোতে শুরু করে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে।

হাওয়াই-জাতীয় আগ্নেয়গিরির কথা আগের অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। এবার বলছি হাওয়াই দ্বীপের দু'টি আগ্নেয়গিরি মোনা

লোয়া ও কিলাউয়ি আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে আরো কিছু কথা। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরের কপালে ছোট টিপের মতো। কী অপূর্ব তার শোভা! প্রকৃতপক্ষে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি পর্বতমালার শীর্ষদেশ, যা সমুদ্রের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের তলদেশ থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড়পড়তা উচ্চতা ১৫ হাজার ফিট। তাই অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে নিচু দ্বীপটিও সমুদ্রের তলদেশ থেকে অন্তত ১৫ হাজার ফিট উঁচু। সেই হিসেবে সবচেয়ে উঁচু পর্বতশীর্ষটির উচ্চতা অন্তত ৩০ হাজার ফিট। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত অবয়বটিই আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি। অর্থাৎ ক্রমে এক বিরাট সময় ধরে আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভা জমে জমে ক্রমে এই দ্বীপগুলি সমুদ্রের ওপরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আগেই বলা হয়েছে, হাওয়াই জাতীয় আগ্নেয়গিরি (যেমন মোনালোয়া, কিলাউয়ি) থেকে ব্যাসল্ট জাতীয় লাভা বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ ফাটল পথে। এই ফাটলের দৈর্ঘ্য বেশ কয়েক মাইল। এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদ্গীরণের আগে ভূমিকম্পের জন্ম হয়। ভূমিকম্পের ফলে ফাটল, আর এই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে তরল উত্তপ্ত লাভা ও গ্যাস। তবে এই জাতীয় লাভায় ছাই বা পাথরের টুকরো উৎক্ষিপ্ত হয় না।

হাওয়াই দ্বীপ বা বড় দ্বীপ তৈরি হয়েছে পাঁচটি প্রাচীন আগ্নেয়-গিরির সমন্বয়ের ফলে। এখনো যে দু'টি আগ্নেয়গিরি সজীব, তাদের নাম আগেই উচ্চারিত।

মোনালোয়ার আকৃতি ডিমের মতো। ৬০ মাইল লম্বা, ৩০ মাইল চওড়া, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৬৮০ ফিট উঁচু অর্থাৎ সমুদ্র তলদেশ থেকে ২৯ হাজার ফিট। এটি এখন সারা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সজীব আগ্নেয়গিরি। এর ঘন আয়তন প্রায় ১০ হাজার ঘন বর্গমাইল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, এই বিরাট আয়তনের সবটাই তৈরি

হয়েছে আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত লাভায়। মোনালোয়ার শীর্ষে ডিমাকৃতি নিচু জায়গা, তিন মাইল লম্বা, প্রায় দেড় মাইল চওড়া গভীরতা ৬০০ ফিট। সাধারণভাবে জ্বালামুখ নামে পরিচিত হলেও জন্মের ইতিহাস অনুযায়ী এটি আসলে কলডেরা। পর্বতের শীর্ষদেশ বসে গিয়ে এর জন্ম। কলডেরার নাম মকুয়াউইউই।

মোনালোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের শুরু জ্বালামুখ থেকে বাষ্প ও গ্যাস উদ্গারণে। তারপর শুরু হয় ফাটল জুড়ে ফোয়ারার মতো লাভা উদ্গীরণ। প্রথম কয়েকদিন প্রচুর লাভা বেরোয়। লাভারী নদী, যা উৎসমুখে মাত্র দু'-তিন ফিট চওড়া, তা বইতে শুরু করে তীব্রগতিতে। এই গতি ঘণ্টায় দশ থেকে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত হতে পারে এবং মাঝে মাঝে উৎসমুখ থেকে বহুদূর পর্যন্ত চলে যায় লাভার স্রোত। ১৮৫৯ সালে লাভার স্রোত দীর্ঘতম পথ অতিক্রম করেছিল। সেবার লাভার স্রোত দশমাস ধরে ৩৩ মাইল পথ পরিক্রমার পর সমুদ্রে পৌঁছে, সমুদ্রের নিচেও বহুদূর প্রবহমান ছিল। প্রাচীনকালে মোনালোয়া আগ্নেয়গিরি থেকে প্রতি ঘণ্টায় ১০ থেকে ৫০ লাখ টন লাভা নিস্থঃত হতো।

১৮৩২ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে মোনালোয়া থেকে গড়ে ৩৬ বছরে একবার করে অগ্ন্যুৎপাত হতো। সময়ের হিসেবে প্রায় মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৬ ভাগ সময় সক্রিয় ছিল মোনালোয়া আগ্নেয়গিরি।

প্রায় ৬ বছর নির্জীব থাকবার পর মোনালোয়া আবার সজীব হয়ে ওঠে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে। ৬ই জানুয়ারি আগ্নেয়গিরি পরিদর্শন কেন্দ্র থেকে তীব্র অথচ গুরুগম্ভীর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। মকুয়াউইউই কলডেরার মেঝেয় যে ৩ মাইল, লম্বা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ভেতর থেকে উৎসারিত হলো তরল লাভার স্রোত। এবং চলল প্রায় তিরিশ দিন ধরে।

১৯৫০ সালের অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় ১লা জুন। প্রায় ১২০০০ ফিট

উচ্চতায় আড়াই মাইল লম্বা ফাটল থেকে প্রথমে প্রচুর গ্যাস ব্যাঙের ছাতার আকারে অঞ্চলটিকে ঘিরে ফেলে। তারপর সেই ফাটল থেকে লাভা বেরোতে শুরু করে অত্যন্ত তরল লাভা। প্রায় ২৪ ঘণ্টা এই ফাটল থেকে লাভা বোরোবার পর লাভা বেরোনো বন্ধ হয়। কিন্তু এরপর ১০,৫০০ ফিট উচ্চতা থেকে ৮০০০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় ৭ মাইল লম্বা আর একটি ফাটল থেকে লাভার উদ্গীরণ আরম্ভ হয়। এই লাভার স্রোত হুকেনা ডাকঘর কয়েকটি বাড়িঘর ও একটি পেট্রোল স্টেশন নষ্ট করে সমুদ্রে পেঁৗছে যায়। লাভার স্রোতের গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৬ মাইল। ১৯৫০ সালের এই অগ্ন্যুৎপাতে মোট লাভার আনুমানিক পরিমাণ ৬০০০ লক্ষ ঘন গজ, অবশ্য এর মধ্যে প্রায় ১০০০ লক্ষ ঘন গজ পরিমাণ লাভা জমা পড়েছে নীল সমুদ্রের অতলে। একটি আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদ্গীরণের পরিমাণের ব্যাপারে এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড। এর সঙ্গে কেবল ১৮৫৯ সালের লাভা উদ্গীরণ অতুলনীয়।

কিলাউয়ি আগ্নেয়গিরির অবস্থান মোনালোয়া আগ্নেয়গিরি দক্ষিণ-পূর্ব ঢালে। তবে উচ্চতা অনেক কম, মাত্র ৪০৯০ ফিট। এর আগ্নেয় শঙ্কুর (Volcanic cone) আকার ডিমের মতো, আয়তন লম্বায় ৫০ মাইল, চওড়ায় ১৪ মাইল। আগ্নেয়গিরি হিসেবে কিলাউয়ির বৈশিষ্ট্য এই, এর জ্বালামুখে একটি তরল লাভার লেক বা হ্রদ রয়েছে। এজন্য এখানে আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯১২ সালে। তাছাড়া মোনালোয়া ও কিলাউয়িকে নিয়ে গড়ে উঠেছে হাওয়াই ন্যাশনাল পার্ক। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি দেখতে উৎসাহী দর্শকদের জন্য কিলাউয়িতে তৈরি হয়েছে কিছু হোটেল। একটি হোটেলের নাম আগ্নেয়গিরির নামে 'ভলকানো হাউস'।

কিলাউয়ির কলডেরা প্রায় আড়াই মাইল লম্বা ও দু'মাইল চওড়া। অনেকটা ডিমের মতো আকৃতি। লাভা ভর্তি তলদেশের গভীরতা প্রায় ৪০০ ফিট। কলডেরা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উত্তপ্ত তরল লাভার

হ্রদ। নাম হালে মাউমাউ যার অর্থ চিরন্তন অগ্নির আবাস। হালেমাউমাউ দেখতে গোল হ্রদের মতো, যার ব্যাস তরল লাভার উদ্গীরণের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। তবে সাধারণত ২০০০ থেকে ৩৫০০ ফিটের মধ্যেই থাকে। গভীরতা কম বেশি ১৩০০ ফিট। হাওয়াইয়ের প্রাচীন কাহিনীতে কথিত আছে, কিলাউয়ি হলো আগ্নেয়গিরির দেবী মাদাম পেলের বাসস্থান। তাই হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীদের বিশ্বাস, অগ্ন্যুৎপাতের আগে মাদাম পেলে দরিদ্র বৃদ্ধার বেশে এসে সবাইকে সাবধান করে দিয়ে যান। সাধারণত কিলাউয়ি আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদ্গীরণ কখনোই এমন বিধ্বংসী নয়। অগ্ন্যুৎপাতের সময় হালেমাউমাউ হ্রদে তরল উত্তপ্ত লাভা জমতে শুরু করে। পরে জ্বালা-মুখের ধারের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে নিচে। তবে ফাটল চুঁইয়ে বৃষ্টির জল লাভার সংস্পর্শে এলে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এ ধরণের বিস্ফোরণ ঘটে ১৭৯০ ও ১৯২৪ সালে। ১৯২৪ সালের বিস্ফোরণে জ্বালামুখের দেওয়াল ভেঙ্গে ধসে পড়েছিল ভেতরে। এছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণের মতো প্রচুর বাষ্প ও মেঘ জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের এক বিস্তীর্ণ অংশ ঢেকে ফেলেছিল। এরপর কিলাউয়িতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ১৯২৪ (জুলাই), ১৯২৭ (জুলাই), ১৯২৯ (ফেব্রুয়ারি ও জুলাই), ১৯৩০ (নভেম্বর-ডিসেম্বর), ১৯৩১-৩২-১৯৩৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর), ১৯৫২ (জুন-নভেম্বর), ১৯৫৪ (মে-জুন), ১৯৫৫ (ফেব্রুয়ারি-মে) ও ১৯৫৯-৬০ সালে।

এবারের আলোচনা আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরি নিয়ে। আইসল্যাণ্ড অর্থাৎ বরফের দেশে আগ্নেয়গিরি! শুনলে খানিকটা অবাক লাগে বই কি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আইসল্যাণ্ড দ্বীপ পুরোপুরিই আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি। নরওয়ের ৫০০ মাইল (৮০০ কি.মি) পশ্চিমে ও গ্রীনল্যাণ্ডের ২০০ মাইল ৩২০ কি. মি পূর্বে অবস্থিত আইসল্যাণ্ডের আয়তন ১,০৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার। আইসল্যাণ্ড

পর্বতময় দেশ এর সবচেয়ে উঁচু পর্বতচূড়া ওরিফা জোকুলের (জোকুলের অর্থ হিমবাহ) উচ্চতা ৬৯৫২ ফিট (২০৯০ মিটার)। আইসল্যাণ্ড দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতের শুরু আজ বহুদিন আগে ইয়োসিন যুগে, প্রায় ৬ কোটি বছর আগে। সেই সময় থেকে লাভা জমে জমে প্রায় ১০,০০০ ফিট পুরু লাভা বা ব্যাসল্টের স্তর তৈরি হয়েছে।

আইসল্যাণ্ডের ছ'টি উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়গিরির নাম ভলকানো কাটলা ও ভলকানো গ্রিমসভটন। ছ'টি আগ্নেয়গিরিই সারা বছর বরফের নিচে ঢাকা থাকে। এই ধরণের আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে চারিপাশের বরফ গলে জল হয়। তৈরি হয় লেক। যদি অগ্ন্যুৎপাত থেকে যথেষ্ট তাপ না পাওয়া যায়, যাতে সমস্ত বরফ গলে জল না হতে পারে, তবে বরফের আস্তরণের নিচে বন্দী জল বরফের তলা দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যায়, আর ওপরের পুরু বরফের আস্তরণ পিছলে নিচে আছড়ে পড়বে। এ ধরণের বরফের আস্তরণ কখনো কখনো ছ'-তিন মাইল লম্বা হতে পারে। এই জল আর বরফের চাঁই ছরন্ত বেগে গ্রাম শহর সব ভাসিয়ে ধ্বংস করে। স্থানীয় ভাষায় এর নাম জোকুললপস যার অর্থ 'চলন্ত হিমবাহ'। এর ধ্বংস করবার ক্ষমতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে ভলকানো গ্রিমসভটন থেকে প্রায় দিন সাতেক ধরে যে জল বন্যার মতো নেমে এসেছে, তার পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০,০০০ ঘন মিটার। ১৯১৮ সালে কাটলা আগ্নেয়গিরি থেকে ছ'দিন ধরে প্রতি সেকেণ্ডে ২,০০,০০০ ঘন মিটার জল নিঃসৃত হয়েছে। এদের তীব্রতার পরিমাপ বোঝা সম্ভব হবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমজনের জলস্রোতের মাপ থেকে। আমজন নদী প্রতি সেকেণ্ডে ১০,০০০ ঘন মিটার জল বহন করছে।

আইসল্যাণ্ডের উত্তরাংশে ব্লাফাল-লিরন্থক অঞ্চলে ১৭২৪ থেকে ১৭২৯ সাল ধরে ফাটলবাহী অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে। এ সময় দীর্ঘ ৩৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে ভূমিকম্পের ফলে।

অবশ্য ফাটল একটি নয়, বেশ কয়েকটি এরপর বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হতে শুরু করল ছাই, ল্যাপিলি, পাথরের বড় টুকরো। এভাবে ফাটল জুড়ে তৈরি হলো বেশ কয়েকটি আগ্নেয়শংকু ও জ্বালামুখ। এত কম জায়গার মধ্যে এতগুলি জ্বালামুখ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই পাঁচ বছরে ১০০০ লক্ষ ঘন মিটার লাভার উদ্গীরণ ঘটেছে এই অঞ্চলে।

আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রেকিয়াডিকের (যেখানে বছর কয়েক আগে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা হয়েছিল) ২০০ মাইল পূবে স্কাপটার পাহাড়। এই অঞ্চলে লাকি ফাটল থেকে ১৭৮৩ সালে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এর আগে সাতদিন ধরে ভূমিকম্প। তারপর সেই ফাটল ধরে বৃষ্টির মতো শুধু ছাইয়ের অবিরাম ধারা। দিন তিনেক পরে ছাই উৎক্ষেপন কমে এলে শুরু হলো দশ মাইল দীর্ঘ ফাটল দিয়ে লাভাস্রোত। এই লাভাস্রোতে ভরে গেল নিচের স্কাফটা উপত্যকা। পরে মেপে দেখা গেছে কিছু কিছু জায়গায় লাভা প্রায় ৬০০ ফিট পুরু। লাকির ফাটল থেকে প্রায় ১২ ঘন কিলোমিটার পরিমাণ লাভা নিঃসৃত হয়েছিল।

এই লাভা উর্বর উপত্যকার এক বিরাট বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে উষর ভূমিতে পরিণত করেছিল। ফলে পরের বছর অজন্মার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সারা দেশ জুড়ে। অনাহার ও রোগে প্রচুর মানুষ ও গৃহপালিত জন্তু মারা পড়ে।

মাউন্ট হেকলা আইসল্যাণ্ডের আর একটি উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়-গিরি। রেকিয়াডিক থেকে ১১০ কিলোমিটার পূবে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এর অবস্থান। এই পাহাড়টির শীর্ষদেশ ২৭ কিলোমিটার লম্বা, চওড়ায় ২ থেকে ৫ কিলোমিটার। শীর্ষদেশ জুড়ে যে বিস্তৃত ফাটল, তাতে বেশ কয়েকটা জ্বালামুখ। এই আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের খবর পাওয়া গেছে ১১০৪, ১১৫৮, ১২০৬, ১২২২, ১২৯৪, ১৩০০, ১৩৪১, ১৩৮৯, ১৪৩৪, ১৫১০, ১৫৪৫, ১৫৯৭, ১৬১৯, ১৬৩৬,

১৬৯৩ (ভয়ংকর বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাত), ১৭২৫, ১৭২৮, ১৭৬৬, ১৮৪৫ (প্রচুর লাভা বেরিয়েছিল), ১৯৪৭-৪৮ (প্রচুর লাভা বেরিয়েছিল) সালে।

৫

সাম্প্রতিক কালের আগ্নেয়গিরি

আগের অধ্যায়ে অতীতের আগ্নেয়গিরির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে অতীত বলতে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়েছে যীশুখৃষ্টেরও জন্মের আগে। কিন্তু এই অধ্যায়ে এমন কয়েকটি আগ্নেয়গিরির কথা বলা হবে, যাদের অস্তিত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল না, যাদের জন্ম বর্তমান ঐতিহাসিক কালে। এই বর্তমান ঐতিহাসিক সময়কেই সাধারণভাবে সাম্প্রতিক কাল বলে বোঝানো হয়েছে। তবে এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজন আছে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের পাশে বা সামান্য দূরে আর একটি জ্বালামুখ তৈরি হলো সাম্প্রতিক সময়সীমার মধ্যে। কিন্তু এই নতুন জ্বালামুখটিকে নতুন আগ্নেয়গিরি বলে অভিহিত করা যাবে না। আসলে এটি পুরনো আগ্নেয়গিরির নতুন নির্গমন পথ। সে যাই হোক, কোনটি পুরনো আগ্নেয়গিরির নতুন নির্গমন পথ, আর কোনটিই বা আনকোরা নতুন আগ্নেয়গিরি সে বিতর্ক বোধহয় থেকে যাবে চিরকাল।

উত্তর আমেরিকায় যে দু'টি নতুন আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়েছে, সে দু'টিরই অবস্থান মেক্সিকোর পশ্চিম প্রান্তে। প্রথমটি জোরুলো আগ্নেয়গিরি, জন্ম ১৯৫৯ সালে, দ্বিতীয়টি পরিকুটিন আগ্নেয়গিরি, জন্ম ১৯৪৩ সালে। তবে অগ্ন্যুৎপাতের দিক থেকে দ্বিতীয়টির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

সাম্প্রতিক কালে যে কয়েকটি নতুন আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত মেক্সিকোর মিচোয়াকান প্রদেশের পরিকুটিন আগ্নেয়গিরি। জন্ম ১৯৪৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি, একটি ভুট্টাক্ষেতে। সেই প্রথম জন্ম থেকে ৯ বছর পর্যন্ত এই আগ্নেয়গিরিটি খুবই সক্রিয় ছিল। ফলে পৃথিবীর বহু আগ্নেয়গিরিবিদদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শুধু মনোযোগ নয়, অনেকেই এই আগ্নেয়গিরির ওপর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য বিখ্যাত আগ্নেয়গিরিবিদ ফ্রেড বুলার্ড এর পাদদেশ থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে নির্মিত একটি বিশেষ ঘরে প্রায় মাস ছয়েক কাটান। খুবই বিপদজনক পর্যবেক্ষণ, কেননা জ্বালামুখ থেকে ছাই, জ্বলন্ত পাথরের টুকরো হরদম উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এমন কি বুলার্ডের অবস্থান কালেই তপ্ত লাভা স্রোত এই ঘরটির মাত্র ৩০ ফিট দূরে থেমে গেছে। অবশ্য ফ্রেড বুলার্ড বিপদের সংকেত পেয়ে ঘর ছেড়ে যাওয়ার পরেই লাভাস্রোতের নিচে ঘরটি চাপা পড়ে যায়।

পারিকুটিন আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়শংকু প্রথম অবস্থায় খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। প্রথম সপ্তাহের শেষে এর উচ্চতা হয় ১৪০ মিটার। এর অগ্ন্যুৎপাতের ক্ষমতাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সময় এর জ্বালামুখ থেকে প্রচুর চটচটে লাভা উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। বিস্ফোরণের শব্দ এতই প্রচণ্ড যে সমস্ত মিচোয়াকান প্রদেশ জুড়ে, এমন কি ৩৫০ কিলোমিটার দূরের গুয়ানোজুয়াতো থেকেও তা শুনতে পাওয়া যায়। কয়েক সেকেণ্ড পরপর টকটকে লাল জ্বলন্ত পাথরের টুকরোগুলি শূন্যে ৬০০ থেকে ১০০০ মিটার উৎক্ষিপ্ত হয়ে আগ্নেয়গিরির ঢালে পড়ে গড়িয়ে পড়ে নিচে নামতে শুরু করে। জ্বলন্ত পাথরের উৎক্ষেপন ও পতন এতই বেশি যে মনে হচ্ছিল যে আগ্নেয়গিরির ঢাল বা আগ্নেয়শংকু যেন আগুনের দড়িতে বাঁধা পড়েছে। জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত আগ্নেয়-বোমার ব্যাস ১/২ মিটার থেকে ১ মিটার। আগ্নেয়গিরির

ঢালে পড়ামাত্র তা' ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। মার্চ মাসের শেষদিকে লাভাস্রোত বন্ধ হলে ছাই-বৃষ্টি শুরু হলো। ছাই-বৃষ্টি এতই প্রচণ্ড, যে ৩২০ কিলোমিটার দূরে মেক্সিকো সিটিতেও মিহি ছাই-বৃষ্টি হলো। ১০ই জুন জ্বালামুখের একটা অংশ ভেঙ্গে বেরিয়ে গেলে লাভাস্রোত শুরু হলো। ১৯৪৩ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে পরিকুটিন আগ্নেয়গিরির মূর্তি সত্যিই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

এভাবেই এক বছরের মধ্যে পরিকুটিন আগ্নেয়গিরির উচ্চতা ভুট্টাক্ষেত থেকে ৩২৫ মিটার বেড়েছিল। ১৯৪৭-এ উচ্চতা ৩৬০ মিটার, ১৯৫০-এ ৩৯৭ মিটার আর ১৯৫২-এ ৪১০ মিটার। এসব উচ্চতাই পুরনো ভুট্টা-ক্ষেতের পরিপ্রেক্ষিতে। এর মধ্যে ১৯৪৪ সালে পরিকুটিনের লাভাস্রোত সান জুয়ান পারান পারিকুটিরো শহরকে ঢেকে দিয়েছিল।

পারিকুটিন আগ্নেয়গিরির লাভা মোট প্রায় ২৫ বর্গ কিলোমিটার জায়গা ঢেকে ফেলেছে। উত্তর অঞ্চলে লাভার বেধ দাঁড়িয়েছে ২৪৫ মিটার। লাভার আস্তরণের তলায় ঢাকা সেই আদি ভুট্টা-ক্ষেতকে আজ আর চেনা সম্ভব নয়। বিখ্যাত আগ্নেয়গিরিবিদ হিসেব করে দেখেছেন, পরিকুটিন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে এই সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ লাভা ও পাথরের টুকরো উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, তার পরিমাণ ১·৪ ঘন কিলোমিটার। ওজন ৩৫,৯৬০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতিদিন ১১ লক্ষ মেট্রিক টন কঠিন পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে লাভার পরিমাণ শতকরা ২৭ ভাগ, বাদবাকিটা পাথরের টুকরো। জলীয় বাষ্প ও গ্যাস উদ্গীরণের পুরো হিসেব পাওয়া যায়নি। তবে ফ্রিস হিসেব করে দেখেছেন, ১৯৪৫ সালে প্রতিদিন গড়পড়তা ১৩,৬০০ মেট্রিক টন জল বা জলীয় বাষ্প নির্গত হয়েছে জ্বালামুখ থেকে।

জোরুল্লো আগ্নেয়গিরির জন্ম ১৭৫৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। অবস্থান পশ্চিম মেক্সিকোর মিচোয়াকান প্রদেশে মেক্সিকো সিটির

১৫০ মাইল পশ্চিমে ও পারিকুটিন আগ্নেয়গিরির দক্ষিণ-পূর্বে। পারিকুটিন আগ্নেয়গিরির মতো জোরুল্লো আগ্নেয়গিরির জন্মভূমিও আগে কৃষি-ক্ষেত ছিল। কিন্তু ১৭৫৯ সালে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবার পরে ছাই আর পাথরের টুকরোর নিচে ক্ষেত চাপা পড়ে যায়। জায়গাটি একটু দুর্গম, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ২৫০০ ফিট। নিকটবর্তী জনপদের মধ্যে রয়েছে ৩ মাইল পূবে লা প্লায়া ও ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লা হুয়াকানা শহর। 'জোরুল্লো' কথার অর্থ স্বর্গ, অর্থাৎ চাষবাস ও পশুপালনের কাজে প্রায় আদর্শ স্থানীয়।

১৭৫৯ সালের জুন মাসে হাসিন্দা দ্য জোরুল্লোর অধিবাসীরা শুনতে পেল মাটির তলায় কী রকম গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছে, সঙ্গে মৃদু ভূমিকম্প। এরকম অবস্থা চলল ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ক্রমে বাড়ল ভূমিকম্প ও শব্দের তেজ। লোকজন ভয় পেয়ে সামনের পাহাড়ে আশ্রয় নিল। এদিকে কে যেন রটিয়ে দিয়েছে, আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর নাকি জোরুল্লো ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই কর্তৃপক্ষ পাজকুয়ারো থেকে যাজক নিয়ে এলেন সমবেত প্রার্থনা-সভার আয়োজন করতে যাতে ঈশ্বরকে কোন রকমে তুষ্ট করা যায়। ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ৯ দিন ধরে উপাসনা চলল, কিন্তু ভূমিকম্প কিংবা মাটির নিচের গুড়গুড় শব্দের কমতি নেই। তবে ২৭ তারিখ নাগাদ একটু যেন কমল। কিন্তু ২৯শে সেপ্টেম্বর নাগাদ হাসিন্দার দক্ষিণ-পূর্বে একটি নালা অঞ্চলের ফাটল চিরে কালো ঘন জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে শুরু করল। সঙ্গে আগুনের হল্কা। ভীত সন্ত্রস্থ মানুষ ভিড় করল গীর্জায়। আকাশে বাতাসে যখন উপসনার সঙ্গীত, এমন সময় শুরু হলো তরল কাদা-বৃষ্টি। সঙ্গে প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ আর বাতাসে গন্ধকের ঘ্রাণ। দু'দিন ধরে জ্বালামুখ থেকে অবিরাম ছাই আর বালি উৎক্ষিপ্ত হলো, সঙ্গে আগুনের হল্কা আর বিস্ফোরণের শব্দ। বালি এত গরম যে যেখানেই পড়ছিল, সেখানেই আগুন ধরে যাচ্ছিল। নদীর বুক এই বালিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

বালির তাপে নিচের জল বাষ্প উষ্ণ প্রসবণের সৃষ্টি করল। তারপর বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণের ফলে অনেকগুলি প্রস্রবণের সৃষ্টি হলো পাহাড়ের গায়ে। প্রস্রবণের জল আকাশের বৃষ্টি সব মিলিয়ে সে এক অভূতপূর্ব বন্যা।

৬ই অক্টোবর জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত ছাই আর পাথরের টুকরোয় লা হুয়াকানা গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল, মানুষজন পাহাড়ে আশ্রয় নিল প্রাণের ভয়ে। ৮ই অক্টোবর পাথর উৎক্ষেপণের প্রচণ্ডতা একটু বাড়ল। এইসব পাথরের আকার কখনো-কখনো একটা ষাঁড়ের শরীরের সমান। ১২ই অক্টোবর মূল জ্বালামুখ থেকে ৬০০ গজ দূরে আর একটি ছোট জ্বালামুখ বা নির্গমন পথ তৈরি হয়ে গেল। ১৭৫৯ সালে শুরু হয়ে জোরুল্লো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত চলেছিল প্রায় ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত। তবে শেষদিকে অগ্ন্যুৎপাতের কোন তীব্রতা ছিল না। ১৭৬৪ সালে বেশ লাভা নিঃসৃত হয়েছে। এই লাভা ৯ বর্গ কিলোমিটার জায়গা ঢেকে ফেলেছিল, লাভার বেধ কিছু কিছু জায়গায় ১০০ মিটারের মতো।

আগ্নেয়গিরিবিদ সিগারস্ট্রমের (১৯৫০) বিবরণ থেকে জানা গেছে, জোরুল্লোর উচ্চতা ১৩৩০ মিটার। জ্বালামুখের আকৃতি ডিমের মতো, বড় ব্যাস ৫০০ মিটার, ছোট ব্যাস ৪০০ মিটার। গড়পড়তা গভীরতা ১২০ মিটার। তবে এখন জোরুল্লো আগ্নেয়গিরির ঢালে ও জ্বালামুখের ভেতরে এত গাছপালা জন্মেছে, যে একে আগ্নেয়গিরি বলে বুঝতে পারাই মুস্কিল। বহুদিন ধরে জোরুল্লো আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে রয়েছে।

নেপলস শহরের ৬ মাইল পশ্চিমে পজুয়োলি বন্দরের কাছে নতুন একটি আগ্নেয়গিরির জন্ম হয় ১৫৩৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর।

রোমান সাম্রাজ্যের বিলাস কেন্দ্র লুক্রিন লেকের কাছে অবস্থিত এই আগ্নেয়গিরির নাম মনতে নুয়োভো অর্থাৎ নতুন পাহাড়। ফ্লেগ্রিয়ান ফিল্ডস অঞ্চলে যেখানে এই নতুন আগ্নেয়গিরির জন্ম,

সেখানে মাত্র ২৫ বর্গ মাইল অঞ্চলের ভেতরে ১৯টি জ্বালামুখ গাদাগাদি করে রয়েছে। গাদাগাদি হবার ফলে দেখা গেছে, পুরনো জ্বালামুখ ভেঙ্গে তারই জায়গায় হয়তো তৈরি হয়েছে নতুন জ্বালামুখ। এই অঞ্চলের আগ্নেয়গিরিগুলির বয়স ভিসুভিয়াসের চেয়ে বেশি হলেও, দীর্ঘ সময় ধরে এগুলি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। কেবল মাত্র ১১৯৮ সালে একটি জ্বালামুখ থেকে গন্ধকবাহী বাষ্প বোরোতে শুরু করে। তাছাড়া ১৫৩৮ সালে নতুন আগ্নেয়গিরি জন্মের কথা তো বলাই হলো। এই নতুন আগ্নেয়গিরিটি জন্মের আগে ভূমিকম্প শুরু হয়। ভূমিকম্পের ফলে খানিকটা অংশ নিচে ডেবে যায় এবং এই নিচু অংশ থেকে প্রথমে ঠাণ্ডা ও পরে গরম জল বেরোতে শুরু করে। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে জায়গাটি ফুলে ফেঁপে ওঠে আর তৈরি হয় একটি ফাটল—যার ভেতরে ছিল অগ্নিময় বস্তু। এরপর ঐ ফাটল দিয়ে শুরু হয় অগ্নিময় পাথরের টুকরো, ছাইয়ের উৎক্ষেপণ। ক্রমে এইসব উৎক্ষিপ্ত বস্তু ফাটলের চারপাশে জমা পড়ে গড়ে ওঠে আগ্নেয়শঙ্কু বা আগ্নেয়গিরির ঢাল।

মনতে নুয়োভোর উচ্চতা ৪০০ ফিট, জ্বালামুখের আকৃতি অনেকটা কাপের মতো। এই অঞ্চলের অন্যান্য আগ্নেয়গিরির মতোই তৈরি হয়েছে ছাই, পাথরের টুকরো, আগ্নেয় ভস্ম দিয়ে। আশেপাশের আগ্নেয়গিরির সঙ্গে বহিরঙ্গে কোনই তফাৎ নেই, কেবলমাত্র বয়সে খুবই নবীন। মনতে নুয়োভোর জন্মের ফলে একটা ব্যাপার ভূবিজ্ঞানীদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার, কীভাবে একটি আগ্নেয়গিরি বেড়ে ওঠে। ব্যারণ ফন বাক প্রমুখ আগ্নেয়গিরিবিদদের ধারণা ছিল, পৃথিবীর বুকে ফোঁড়ার মতো আগ্নেয়গিরি ফুলে ফেঁপে ক্রমে বড় চেহারা নেয়। এর ভাষায় আগ্নেয়গিরির উত্থান ঘটে। কিন্তু চার্লস লিয়েল প্রমুখ আগ্নেয়গিরিবিদরা বিশ্বাস করতেন, লাভা, ছাই, পাথরের টুকরো, আগ্নেয় ভস্ম ইত্যাদি মিলে ক্রমে বেড়ে বা বড় হয়ে ওঠে আগ্নেয়গিরি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী চার্লস লিয়েল বিশ্বাস-

যোগ্যভাবে প্রমাণ করেন, আগ্নেয়গিরির পরিবর্ধন দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই হয়। কিন্তু ব্যারণ ফন বাক ব্যাপারটাকে মেনে নেন নি। তিনি বলেছেন, আগ্নেয়গিরির ওপরে পড়ে থাকা ছাই, পাথরের টুকরো—এ সবই বাহ্যিক ব্যাপার। সত্যি সত্যিই আগ্নেয়গিরির বেড়ে ওঠার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক সমুদ্রের জলের নিচেও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অহরহই ঘটতে থাকবে। সমুদ্রের গড় গভীরতা ১৩,০০০ ধরে নিলে বুঝতে পারা যায় আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি আগ্নেয়-দ্বীপ গড়তে কতখানি লাভার উদ্গারণ প্রয়োজন হয়েছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই, সাসোয়া, টংসা দ্বীপ ইত্যাদি।

তবে অতল সমুদ্রের নিচে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে সাধারণ-ভাবে মানুষের পক্ষে তার হদিশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সমুদ্রের নিচে অগ্ন্যুৎপাত ও বিস্ফোরণ ঘটলে সাধারণত স্থানীয় অঞ্চলের জল উত্তপ্ত ও রং বদলে কালো হয়ে ওঠে। সেই সময় কোন চলমান জাহাজ টাহাজ সামনে পড়লে তার নাবিকদের চোখে অগ্ন্যুৎপাত ধরা পড়তে পারে। যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম তবে সমুদ্রের বুকে নতুন কোন দ্বীপ জেগে উঠলে তা' অভিজ্ঞ নাবিকদের চোখে ধরা পড়ে যায়।

এভাবেই সমুদ্রের নিচে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ১৮৩১ সালে ভূমধ্যসাগরের বুকে নতুন একটি আগ্নেয়-দ্বীপ জেগে ওঠে। নাম গ্রাহাম দ্বীপ। অবস্থান সিসিলি দ্বীপ থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। অথচ এই দ্বীপটির জন্মের বছর কয়েক আগেও গ্রাহাম দ্বীপের জায়গায় গভীরতা ছিল ৬০০ ফিট।

দ্বীপটির জন্মের সপ্তাহ-দুয়েক আগে ১৮৩১ সালে একটি জাহাজ ঐ অঞ্চল পেরোবার সময় অনুভব করে জাহাজটা যেন কোন ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে। আসলে সেই সময় ভূমিকম্প হচ্ছিল।

এই ভূমিকম্প সিসিলির তটদেশে অনুভব করা গেছে। এরপর ১০ই জুলাই নাগাদ ঐ অঞ্চল পেরোবার সময় আর একটি জাহাজের নাবিকরা দেখতে পায়, সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে আসছে প্রায় ৬০ ফিট উঁচু, ৮০০ গজ পরিধির এক বিরাট জলস্তম্ভ। জলস্তম্ভের পেছন পেছন ঘন পুঞ্জীভূত বাষ্প শূন্যে প্রায় ১৮০০ ফিট উৎক্ষিপ্ত হলো। সেই জাহাজটি ফেরবার সময় দেখল, ওখানে একটি নতুন দ্বীপের জন্ম হয়েছে। জল থেকে দ্বীপের উচ্চতা প্রায় ১২ ফিট। মাঝে একটি জ্বালামুখ, তার ভেতর থেকে প্রচুর বাষ্প, পাথরের টুকরো, উৎক্ষিপ্ত। আশে পাশের সমুদ্রে ভাসছে অজস্র মৃত মাছের শরীর। সমুদ্রের রং চকলেট থেকে লাল, টগবগ করে ফুটছে। সারা জুলাই মাস এ রকমই চলল। এসময় দ্বীপটির উচ্চতা বেড়ে হলো ৫০ থেকে ৯০ ফিট, পরিধি ¾ মাইল। কিন্তু আগস্টের প্রথম সপ্তাহে দ্বীপটির উচ্চতা বেড়ে হলো ২০০ ফিট, পরিধি ৩ মাইল। দু মাসের মধ্যে দ্বীপটি তার পূর্ণাঙ্গ চেহারা পেয়ে গেল। এভাবেই জন্ম হলো গ্রাহাম দ্বীপের।

এভাবেই জন্ম হয়েছে আরো সব আগ্নেয়দ্বীপের। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের অ্যাজোর দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরের ফয়াল দ্বীপ (কেপলিনহোস আগ্নেয়গিরি), দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্যালকক দ্বীপ, আইসল্যাণ্ডের কাছে নোয়ি ভলকানো, আলাসকার কাছে বোগাসলফ আগ্নেয়গিরি ও জাপানের কাছাকাছি মিয়েজিন-লিও আগ্নেয়গিরি (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ১৯৫২)। টোকিও থেকে ১০০০ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত ও গাসাওয়ারা দ্বীপের আশেপাশে সম্প্রতি অগ্ন্যুৎপাত আবার শুরু হয়েছে (জুলাই, ১৯৭৯)।

৬

আগ্নেয়গিরিজাত শক্তির কথা

আগ্নেয়গিরি শুধু মানুষের জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে না, আগ্নেয়গিরিজাত তাপশক্তি মানুষের বহু প্রয়োজন মেটাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, আগ্নেয়গিরি প্রধান অঞ্চলগুলিতে আকছার দেখতে পাওয়া যায় উষ্ণ প্রস্রবণ (hot spring), গিজার এবং ধূম-প্রস্রবণ (fumarole)। এ সব তাপের মূল উৎস আগ্নেয়গিরি। কোন আগ্নেয়গিরি যখন নির্জীব হয়ে আসে, অন্তর্গত ম্যাগমাও ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আর ঠাণ্ডা হতে হতে ম্যাগমা থেকে বেরিয়ে আসে গরম গ্যাস। এর মধ্যে অবশ্য বেশির ভাগই জলীয় বাষ্প, সামান্য কিছু অংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, ক্লোরাইড ইত্যাদি। এই গরম গ্যাস ও বাষ্প পাথরের ফাটল দিয়ে ওপরে উঠে ভূ-জল অর্থাৎ পাথরের ভেতরে সঞ্চিত জলের সঙ্গে মিশে যায়। আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত গ্যাসের সংস্পর্শে ভূ-জল গরম হয়ে ওঠে। এভাবে সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্রস্রবণ, বা গিজার।

কখনো কখনো জল শুধু অল্প গরম (উষ্ণ প্রস্রবণ), কিন্তু কোথাও কোথাও জল এতই উত্তপ্ত যে তা' টগবগ করে ফুটতে থাকে। আবার কখনো কখনো তাপ এতই বেশি, যে জল ফুটে বাষ্প হয়ে তা' পাথরের ফাটল দিয়ে বেরোয় (গিজার)। উষ্ণ প্রস্রবণের সঙ্গে গিজারের একটা তফাৎ আছে। উষ্ণ প্রস্রবণে শুধু গরম জল পাওয়া যায়। কিন্তু গিজার থেকে কিছুক্ষণ পরপর উৎক্ষিপ্ত হয় গরম জল ও বাষ্প। আমেরিকার ইয়োলোস্টোন পার্কের গিজার একটি ভালো উদাহরণ। যদিও এ অঞ্চলে গত ১০০০ বছরের মধ্যে

আগ্নেয়গিরির কোন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে নি, তবু এ অঞ্চলে প্রায় হাজার তিনেক গিজার বা উস্র-প্রস্রবণ দেখে বুঝতে পারা যায়, পাথরের গভীরে এখনো কত উত্তাপ জমা হয়ে আছে। মনে হয়, পাথরের নিচের ম্যাগমা এখনো তেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। অবশ্য ম্যাগমা যে সহজে ঠাণ্ডা হয়ে যায় না, এটা মানুষের কাছে আশীর্বাদ। কারণ তা' না হলে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর ভেতরের উত্তাপ নিজের প্রয়োজনে এত দীর্ঘদিন ধরে লাগাতে পারত না।

শক্তি উৎপাদনের জন্য মূলত নির্ভর করতে হয় গিজার বা ধূম প্রস্রবণের ওপর। ধূম প্রস্রবণ বলতে বোঝায় প্রায় নির্জীব আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, বা অন্য কোন ছিদ্র, যার মুখ থেকে কেবল গ্যাস ও বাষ্প বেরোচ্ছে। সাধারণভাবে জলীয় বাষ্পকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। মূল (**primary**) বাষ্প, যা ম্যাগমা থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসে আর ম্যাগমার তাপের প্রভাবে তপ্ত ভূ-জল থেকে অ-প্রধান (**secondary**) বাষ্প বেরিয়ে আসে। তবে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ফাটল দিয়ে যে বাষ্প বেরিয়ে আসে তাতে দু'ধরনের বাষ্পই মিশে থাকে।

প্রাচীনকাল থেকে উষ্ণ প্রস্রবণের জলে মানুষ স্নান, কাপড় কাচার কাজ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট ও অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য উষ্ণ প্রস্রবণের অঞ্চল সুসজ্জিত স্নান-ঘর থাকত। অবশ্য সাম্প্রতিক কালেও এসব অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের জন্য সুবৃহৎ স্নান-ঘর, স্বাস্থ্য-নিবাস ইত্যাদি গড়ে উঠছে। সেযুগে এসব উষ্ণ প্রস্রবণ ও গিজার যে শক্তির উৎস হতে পারে, সে চিন্তা বা প্রয়াস তখনো শুরু হয় নি। সম্প্রতি এ ধরনের প্রয়াস বিশেষভাবে শুরু হয়েছে পৃথিবীর চারটি অঞ্চলে। (১) টুসক্যানি, ইতালি, (২) আইসল্যাণ্ড (৩) নিউজিল্যাণ্ড ও (৪) ক্যালিফোরনিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

উষ্ণ প্রস্রবণ বা গিজারের তাপকে শক্তিতে পরিণত করে (**Geothermal energy**) তা' মানুষের প্রয়োজনে লাগানোর ব্যাপারে পথিকৃৎ ইতালি। অবশ্য ইতালির এক বিস্তৃত অঞ্চল আগ্নেয়গিরি

প্রধান হওয়ায় প্রচুর উষ্ণ প্রস্রবণ বা গিজারের ছড়াছড়ি এদিকে। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য টুসক্যানির লারডেরেল্লো অঞ্চল। অবস্থান ফ্লোরেন্সের ৫০ মাইল দক্ষিণে। ইতালির মধ্যে সর্বপ্রথম এই অঞ্চলটিকে ভূ-তাপ শক্তি আহরণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ১৯৫২ সালের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, সে সময় ইতালিতে যত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতো, তার প্রায় শতকরা ৬ ভাগই এই ভূ-তাপ শক্তি অর্থাৎ গিজারের তাপ থেকে তৈরি বিদ্যুৎ। তবে এখন এই পরিমাণ অনেক বেড়েছে। বিদ্যুৎ তৈরী করা ছাড়াও প্রাকৃতিক বাষ্পের সঙ্গে মিশে থাকা বাদ বাকি গ্যাস উদ্ধার করে একটি রাসায়নিক কারখানা চলছে। ইতালিতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাসের অনটন থাকায় গিজারের বাষ্প থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথচ মাত্র দেড়শো বছর আগেও লারডেরেল্লোতে এই বাষ্প হেলায় ফেলায় নষ্ট হতো। অতীতে মাটি ফুঁড়ে বেরোনো এই বাষ্পকে স্থানীয় মানুষরা অশুভ বলে মনে করত। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একজন রসায়নবিদ উত্তপ্ত বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে তৈরি হওয়া লেকের জল থেকে বোরিক অ্যাসিড আলাদা করেন। এরপর ১৮২৭ সালে কাউন্ট লারডেরেল নামে এক ফরাসী ভবঘুরে কিন্তু উৎসাহী যুবক উত্তপ্ত বাষ্পের সঙ্গে লেকের জলের বিক্রিয়ার বোরিক অ্যাসিড তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। এবং রীতিমত লাভজনক একটি সংস্থাও গড়ে ওঠে। এই রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক বাষ্পকে নানা কাজে লাগানো হলেও তখনো পর্যন্ত এই বাষ্প থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কথা কারো মাথায় আসে নি। ১৮৯৭ সালে প্রাকৃতিক বাষ্পের সহায়তায় বয়লারকে উত্তপ্ত করে ইঞ্জিন চালানোর কাজে লাগানো হলো। ১৯০৪ প্রিন্স পিয়েরো কনতে প্রাকৃতিক বাষ্পের সাহায্যে পিসটন ইঞ্জিন চালিয়ে ছোট ডায়নামো চালালেন। তৈরি হলো বিদ্যুৎ, রাসায়নিক কারখানায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলল। আরো বেশি বাষ্প পাবার জন্য ড্রিলিং শুরু হলো। বেশি গভীরতায় অতিরিক্ত

চাপ ও তাপের বাষ্প পাওয়া গেল। ১৯১৩ সালে প্রথম স্টিম টারবাইনের সঙ্গে জোড়া হলো ২৫০ কিলোওয়াট জেনারেটার। ১৯১৬ সালে ৩০০০ কিলোওয়াটের তিনটি ইউনিট জোড়া হলো। ১৯২৩ সালে বসানো হলো টারবো-জেনারেটর। ১৯৪৪ সালে ১৩৫,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির বন্দোবস্ত হলো। ১৯৬০ সালে বিদ্যুৎ তৈরি হলো প্রায় ২০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা।

এছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে লারডেরেল্লো থেকে প্রতি বছর প্রায় ৮০০০ টন বোরিক অ্যাসিড ও ৪৫০০ টন বোরাক্স উৎপাদিত হতো, যা শিল্পের চাহিদা মিটিয়েছে। এই অঞ্চলের ভূমির নিচে কাছাকাছিই যে রয়েছে উত্তপ্ত হ্রদয়ের মতো ম্যাগমা, তার প্রমাণ বাষ্পের সঙ্গে মিশে থাকা বোরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য গ্যাস।

নিউজিল্যাণ্ডের নর্থ আইল্যাণ্ডে বেশ কিছু আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এদের মধ্যে ১৮৮৬ সালে ডায়াওয়েরা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। হোয়াইট আইল্যাণ্ড আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়ে ওঠে ১৯১৪ ও ১৯২৬ সালে। রুয়াপেহু আগ্নেয়গিরি থেকেও ছাইবৃষ্টি হয় ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে। তাই নিউজিল্যাণ্ডের ভূ-তাপ শক্তিবাহী অঞ্চল স্বভাবতই নর্থ আইল্যাণ্ডে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলির অবস্থান টাউপো হ্রদের আশেপাশে! অবশ্য কেবলমাত্র ওয়াই-রাকেইয়ের কাছে কারাপিটি গিজার ছাড়া আর কোথাও বাষ্পের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

স্থানীয় মাওরি অধিবাসীরা উষ্ণপ্রস্রবণের জল স্নান, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহার করত। তবে ভূ-তাপ শক্তির এই উৎসকে খুবই সম্প্রতি অন্যান্য নানা কাজে লাগানো হচ্ছে। রোটারুয়া অঞ্চলে ১৯৪০ সাল নাগাদ কতগুলি অগভীর উষ্ণ-কূপ খনন করা হয়। এই উষ্ণ জল ও বাষ্পের সাহায্যে সরকারী অফিস, থিয়েটার হল, হোটেল ও স্কুল ইত্যাদি গরম রাখবার ব্যবস্থা চালু হয়। এরপর পঞ্চাশের দশকে ওয়াইরাকেই অঞ্চলে অনেকগুলি গভীর কূপ

(প্রায় ১২০০-১৫০০ ফিট গভীর) খনন করা হয় যাতে উত্তপ্ত বাষ্পের বিনিময়ে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা যায়। হিসেব কষে দেখা গেছে ওয়াইরাকেই অঞ্চলে বাষ্পের পরিবর্তে ১৩৪,৬০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা সম্ভব। অবশ্য ১৯৬১ সালে এখানে ৯১,৪০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হতো। বিদ্যুৎশক্তি ছাড়াও এই বাষ্প থেকে ভারী জল (**heavy water**) উৎপাদিত হচ্ছে আণবিক শক্তি কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্যে।

আইসল্যাণ্ডে প্রচুর উষ্ণ প্রস্রবণ ও গিজার রয়েছে। উষ্ণ প্রস্রবণের সঙ্গে গিজারের তফাতের কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে সারা আইসল্যাণ্ডে প্রায় ৩০টি গিজার রয়েছে। অর্থাৎ এখানে মোট উষ্ণ প্রস্রবণের শতকরা মাত্র ১ ভাগ গিজার। তুলনায় আমেরিকার ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের মোট উষ্ণ প্রস্রবণের শতকরা ১০ ভাগই গিজার। সংখ্যার দিক থেকে ইয়োলোস্টোনে গিজারের সংখ্যা প্রায় ২০০। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গিজার 'বিগ গিজির'এর (**Big Geysir**) অবস্থান আইসল্যাণ্ড। এর নাম থেকেই গিজার নামটি এসেছে। নামটি দিয়েছেন বিশপ সেইনসন ১৬৪৭ সালে। 'বিগ গিজির' গিজারটি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নিস্ক্রিয় হয়েছিল। পরে পাদদেশে একটি গর্ত কেটে দিলে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর বাষ্প মিশ্রিত জল মাটি থেকে প্রায় ১০০-২০০ ফিট ফোয়ারার মতো উঠে আসে তলদেশের চাপে।

আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষত রাজধানী রেকিয়াভিকের আশেপাশে বেশ কিছু উষ্ণ প্রস্রবণ বা গিজার রয়েছে। এজন্য বহুদিন থেকেই রেকিয়াভিক শহরে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যের উষ্ণ স্নানাগার তৈরি হয়েছে। গরম জল বিনা পয়সায় পাওয়া যায় বলে অনেকে আবার এখানে নিজেদের রান্নাবান্নাও সেরে নেয়। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই গরম জল আর বাষ্পের সাহায্যে সমুদ্রজল থেকে নুন বা সাধারণ লবণ বের করা

হতো। নানা ধরণের শাকসব্জী ফল ফলাবার জন্যও এই গরম জল ব্যবহৃত হতো।

১৯২৮ সালে রেকিয়াভিক শহরের হাসপাতাল, স্কুল ও সুইমিংপুল উষ্ণ রাখবার জন্য কাছের প্রস্রবণ থেকে উষ্ণ জল পাঠানো হতো। এই পরিকল্পনা সার্থক ও সন্তোষজনক হওয়ায় সমস্ত শহরকে ক্রমে এর আওতায় আনার জন্য একটি পরিকল্পনা হলো। অবশ্য এজন্য প্রয়োজন আরো বড় উষ্ণ জলের উৎস। রেকিয়াভিক থেকে ১০ মাইল দূরে রেকির অঞ্চলের একটি উষ্ণ প্রসবণকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা হলো। এই প্রস্রবণ থেকে মিনিটে ১৩২০ গ্যালন জল পাওয়া যাচ্ছিল। তাপমাত্রা ৮০° সেনটিগ্রেড। কিন্তু এই পরিমাণ জল রেকিয়াভিকের জন্য যথেষ্ট নয়, তাই আরো কয়েকটি গভীর (৪৫০ থেকে ১২০০ ফিট) কূপ খনন করে গরম জল সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হলো। বর্তমানে রেকিয়াভিকের প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে গরম জল পাঠানো হয়। তাছাড়া রেকিয়াভিক শহরের ভেতরেই কূপ খনন করে গরম জল পাওয়া যাচ্ছে। আইসল্যাণ্ডের আর একটি শহর সেলফসেও রেকিয়াভিকের মতো বাড়ি বাড়ি উষ্ণ জল সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

আমেরিকার ক্যালিফোরনিয়া অঞ্চলে বেশ কিছু গিজার আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৪৬ সালে। গিজার-সমৃদ্ধ অঞ্চলটির অবস্থান সানফ্রানসিসকো শহরের প্রায় ৯৫ মাইল উত্তরে। গিজায় আবিষ্কৃত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই ১৮৫২ সালে এখানে হোটেল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। শুধু উষ্ণ প্রস্রবণ বা গিজার নয়, কয়েকটি ধূম-প্রস্রবণ বা ফিউমারোলও রয়েছে এ অঞ্চলে। সবচেয়ে সক্রিয় অঞ্চলটির আয়তন প্রায় ৫০ একর। স্মোক স্ট্যাক ধূম প্রস্রবণ থেকে সবচেয়ে বেশি বাষ্প ও গ্যাস বেরোয়। এছাড়া অন্য দু'টি ফিউমারোলের নাম স্টিমবোট ও সেফটি ভালভ। শেষোক্ত দু'টি ফিউমারোলে মাটি থেকে ৩ ফিট নিচে বাষ্পের উত্তাপ প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড। ১৯২১ সালে এই

থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা চলে এবং ১৯৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎশক্তি তৈরি শুরু হয়। তবে খুবই ছোট আকারে। বড় আকারের ভূ-তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র (১২,৫০০ কিলোওয়াট) ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয় সোনোমা কাউনটিতে। ইয়োলোস্টোন পার্ক অঞ্চলের গিজার আবিষ্কৃত হয় ১৮৭০ সালে।

যে চারটি দেশের কথা বলা হলো, সেগুলি ছাড়াও আরো যে কয়েকটি দেশে ভূ-তাপ শক্তি সদ্ব্যবহার করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষ, ওয়েস্ট ইনডিজ, এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া, জাপান ও রাশিয়া।

ভারতবর্ষেও বহু উচ্চ প্রস্রবণ রয়েছে। সংখ্যায় প্রায় ২৫০। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর ও বিহারের রাজগীর অঞ্চলের উষ্ণ প্রস্রবণের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তবে এগুলি এখনো পর্যন্ত মূলত স্নান করবার স্থান হিসেবেই ব্যবহৃত। অনেকের ধারণা, এসব উষ্ণ প্রস্রবণের জলে মিশ্রিত খনিজ পদার্থ স্নায়ুরোগ ও চর্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি, কোলাবা ও খানা জেলায়ও বহু উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। তবে ইদানিং যেসব উষ্ণ প্রস্রবণ নিয়ে ভারতবর্ষে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, সেগুলির অবস্থান জম্মু-কাশ্মীরের লাদাক জেলার পুগা উপত্যকায়, এবং হিমাচল প্রদেশের মণিকরণে। এদের মধ্যে আবার পুগা উপত্যকার উচ্চ প্রস্রবণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ৪৬০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পুগা উপত্যকার উষ্ণ প্রস্রবণ আবিষ্কৃত হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে। এই উষ্ণ প্রস্রবণের জলের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠের ওপরে ৫০ থেকে ৮৩ ডিগ্রি সেনটিগ্রেডের মধ্যে। তবে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে ড্রিলিং কূপের মধ্যে ১১০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড তাপমাত্রা লক্ষ করা গেছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে রাসায়নিক কারখানা স্থাপনে, ঢাকা ঘরে চাষবাস, স্থানীয় বাড়িঘরকে উষ্ণ রাখা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব কিনা—এগুলি খতিয়ে দেখবার জন্য কাজ চলছে।

ভারতের যে সব জায়গায় উষ্ণ-প্রস্রবণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য বিহারে হাজারিবাগ জেলার সুরজকুণ্ড, মুঙ্গের জেলার সীতাকুণ্ড, ভীমবাঁধ, ঋষিকুণ্ড, সাঁওতাল পরগণা জেলার ডণ্ডেশ্বরী, নালন্দা জেলার (রাজগীর) ব্রহ্মকুণ্ড ; মহারাষ্ট্রে খানা জেলার লছমনকুণ্ড, কোলাবা জেলার উনহেরা ; পানজাবে গুরগাঁও জেলার মোহ্না, পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর।

জাপানে নারুকো উষ্ণ প্রস্রবণ ও সোভিয়েট রাশিয়ার কামচাটকা অঞ্চলের বাষ্প থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হচ্ছে।

৭

পৃথিবীর কোথায় কোথায় আগ্নেয়গিরি

সারা পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রায় এক হাজার। কিন্তু ঐতিহাসিক সময়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে, এমন আগ্নেয়গিরির সংখ্যা ৫০০র বেশি হবে না। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে সারা পৃথিবীতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির যে তালিকা তৈরি হয়েছে, তাতে সক্রিয় বা সজীব আগ্নেয়গিরির সংখ্যা ৪৭৬। এর মধ্যে আবার ৬০টি আগ্নেয়গিরি সমুদ্রতলে অবস্থিত। তবু সঠিকভাবে বলতে গেলে এই তালিকাও যুক্তিপূর্ণ নয়, কারণ এই তালিকার মধ্যে এমন আগ্নেয়গিরিকে ধরা হয়েছে, যা হয়তো ঐতিহাসিক কোন এক সময়ে সজীব ছিল, কিন্তু বিগত বহু শতাব্দী যাবৎ সেই আগ্নেয়গিরি নীরব, সজীবতার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। এক্ষেত্রে এ ধরণের আগ্নেয়গিরিকে সজীব বা সক্রিয় বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এ কারণে বুলার্ড (১৯৬২) সক্রিয় আগ্নেয়গিরির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন, যাতে মোটামুটিভাবে বিগত কয়েক শতাব্দীতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোকেই ধরা হয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বৃত্ত		মোট সংখ্যা	...২৮৩
এশিয়া ও দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল		...১৬৩	
কামচাটকা	...২০		
কুরিল দ্বীপপুঞ্জ	...৩৩		
জাপান	...৪৯		
ফিলিপাইনস	...১১		
মেলানেশিয়া	...২৯		
নিউজিল্যাণ্ড ও নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ	...২১		
উত্তর আমেরিকা		... ৪৮	
আলাসকা ইত্যাদি	...৩৬		
পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	... ১		
মেকসিকো	...১১		
মধ্য আমেরিকা		... ৩১	
কোস্টা রিকা	... ৬		
নিকারাগুয়া	...১১		
এল সালভাদোর	... ৭		
গুয়াতেমালা	... ৭		
দক্ষিণ আমেরিকা		... ৪১	
দক্ষিণ আনদিজ	...২২		
মধ্য আনদিজ	... ৮		
উত্তর আনদিজ	...১১		
আলপাইন-হিমালয় অঞ্চল			... ৯৮
ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ		... ৩	
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল			
			মোট ৩৮১

		মোট সংখ্যা	
(ইতালি, সিসিল ইত্যাদি)		...১৭	
ব্যারেন দ্বীপ (বঙ্গোপসাগর)		...১	
ইন্দোনেশিয়া		...৭৭	
সুমাত্রা	...১২		
জাভা	...২০		
ছোট সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ	...২০		
বান্দা সাগর	... ৮		
সেলিবিস	... ৬		
সাংগিহি দ্বীপপুঞ্জ	... ৫		
মলুক্কা	... ৬		
প্রশান্ত মহাসাগর			... ৭
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ	... ৪		
গ্যালাপাগস দ্বীপপুঞ্জ	... ৩		
আটলান্টিক মহাসাগর			... ৪৬
আইসল্যাণ্ড		...২৬	
অ্যাজোর দ্বীপপুঞ্জ		... ৯	
ছোট অ্যানাটিলিস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)		... ৯	
সেণ্ট পল রক্স		... ১	
কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ		... ১	
ভারত মহাসাগর			... ২
রি-ইউনিয়ন দ্বীপ		... ১	
হার্ড দ্বীপ		... ১	
আফরিকা			... ১৬
অ্যানটারটিকা			... ২
			মোট ৭৩

মোট ৩৮১ + ৭৩ = ৪৫৪

পূর্বের তালিকা থেকেই বুঝতে পারা যায়, পৃথিবীর বেশির ভাগ সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগরীয় বৃত্তে। এই অঞ্চলে সজীব আগ্নেয়গিরির এতই আধিক্য যে এর নাম 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিবলয়'। এই অঞ্চলের আগ্নেয়গিরিগুলি এখনো পর্যন্ত সজীব। শুধু তাই নয়, অতি সাম্প্রতিককালেও নতুন নতুন আগ্নেয়গিরির জন্ম হচ্ছে এই অঞ্চলে। এ ছাড়া ইউরোপ থেকে শুরু করে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত আলপাইন-হিমালয় বলয়ে রয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়গিরি। এই দুটি বলয় ছাড়াও প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে রয়েছে আরো কিছু বিচ্ছিন্ন আগ্নেয়গিরি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ে আগ্নেয়গিরিগুলির অবস্থান মহাদেশের প্রান্তদেশে। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরকে ঘিরে যে মহাদেশগুলি অবস্থিত, তাদের তটদেশে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এসব অঞ্চলে ভূমিকম্পের ব্যাপকতাও অনেক কম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব কম—এই আবিষ্কার থেকে একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, এই অঞ্চলের ভূত্বক এখনো তুলনামূলকভাবে নরম অবস্থায় রয়েছে, পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়গিরিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

নাম	**উচ্চতা/মিটার**	**শেষ অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ/সময়**
(১) কটোপাকসি, আনদিজ পর্বতমালা (ইকুয়েডর)	৫৮০৫	বাষ্প
(২) পোপোকাটেপেটল, আলটিপ্ল্যানো দ্য মেকসিকো (মেকসিকো)	৫৩৬৫	বাষ্প
(৩) ক্লাইভুশেভস্কায়া, কামচাটকা (সোভিয়েট রাশিয়া)	৪৬৭৫	১৯৬৪

নাম	উচ্চতা/মিটার	শেষ অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ/সময়
(৪) র‍্যাঙ্গেল, র‍্যাঙ্গেল পর্বত (আলাসকা)	৪২০৫	বাষ্প
(৫) তাজুমুলকো (গুয়াতেমালা)	৪১৪৫	গর্জন ধ্বনি
(৬) ফুয়েগো সিয়েরা মাদ্রে (গুয়াতেমালা)	৩৭৭৫	১৯৬২
(৭) ইরিবাস, রস দ্বীপ (আণ্টারটিকা)	৩৭৩৫	বাষ্প
(৮) রিন্দজানি, লমবোক (ইন্দোনেশিয়া)	৩৬৭০	১৯৬৪
(৯) সিমেরু, জাভা (ইন্দোনেশিয়া)	৩৬১৮	১৯৬৩
(১০) মাউন্ট এটনা, সিসিলি (ইতালি)	৩৩১৫	১৯৭৯
(১১) আস্থঙ্গ, বালি (ইন্দোনেশিয়া)	৩০৩৫	১৯৬৪
(১২) দ্য পিক, ত্রিস্তান দ্য কুনহো (দক্ষিণ আটলাণ্টিক)	২০৩০	১৯৬১
(১৩) কিলাউয়ি (হাওয়াই)	১২২৫	১৯৬১
(১৪) স্ট্রমবলি (লিপারি দ্বীপপুঞ্জ)	৯১০	১৯৫৬
(১৫) সার্টসে (আইসল্যাণ্ড)	১৭০	১৯৬৩
(১৬) আনা ক্রাকাতোয়া (ইন্দোনেশিয়া)	১৬৩	১৯২৯

৮

আগ্নেয়গিরি কেন ?

আগ্নেয়গিরি কেন ? , ভূত্বক গলিয়ে দেবার মতো এত তাপই বা আসে কোত্থেকে ?

পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলির ভৌগলিক অবস্থান বিচার করলে দেখা যায়, এদের অবস্থান মূলত পৃথিবীর নবীন পর্বতমালা অঞ্চলে কিংবা এমন সব দ্বীপে, যেখানে নতুন পাহাড় তৈরি হচ্ছে। এর আগের অধ্যায়েই এক হিসেব থেকে দেখা গেছে পৃথিবীর অধিকাংশ সজীব আগ্নেয়গিরির অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ে। এই বলয়ের মধ্যে রয়েছে কামচাটকা, কুরিল দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, অ্যালুইশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগ। এছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইতালি, গ্রীস, তুর্কী, ইরাণ ইত্যাদি দেশের নবীন (আলপ্স ইত্যাদি) পর্বতমালা অঞ্চলেও রয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়গিরি।

পুরনো যুগের পর্বতমালা ও আনুষঙ্গিক পাথর পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পাই, অতীত ভূতাত্ত্বিক যুগেও নবীন পর্বতমালা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উদ্গীরিত হয়েছে আগ্নেয়শিলা, যার জন্ম গলন্ত শিলা জুড়িয়ে। পাহাড়ের জন্ম ও আগ্নেয়শিলার জন্ম—এই দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক লক্ষ করেছেন ভূতাত্ত্বিকরা। কিন্তু এদের মধ্যে এই সম্পর্কটা কী ধরনের এবং কেন—তা' বুঝতে হলে আরো একটু আলোচনার প্রয়োজন।

অনেক ভূবিজ্ঞানী মনে করেন, গলন্ত অবস্থা থেকে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। দুধের সরের মতো পৃথিবীর শরীরের ওপর সৃষ্টি হয়েছে এক পাতাল স্তর, যার বৈজ্ঞানিক নাম ভূত্বক (crust)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর ওপরের স্তর ঠাণ্ডা হয়ে এলেও ভেতরটা যে এখনো খুব গরম—কয়লা বা সোনার খনিতে নামলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞানীদের

পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে, সাধারণভাবে প্রতি ১০০ মিটার গভীরতার জন্য তাপমাত্রা গড়পড়তা বেড়ে যায় ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অবশ্য শুধুমাত্র গভীরতা বাড়া-কমা নয়, পাথরের স্বভাবের ওপরও উষ্ণতা নির্ভর করে। যেমন, যেখানে তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত শক্ত আগ্নেয় পাথর রয়েছে, সেখানকার উত্তাপ সাধারণভাবে একটু তো বেশি হবেই। এভাবে হিসেব করে ভূবিজ্ঞানীরা আন্দাজ করেছেন ১০০ কিলোমিটার গভীরতায় সম্ভাব্য তাপমাত্রা প্রায় ১০০০-১২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা এর চেয়েও বেশি হতে পারে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে ১০০ কিলোমিটার গভীরতায় পাথর থাকবে গলন্ত অবস্থায়। কিন্তু অত গভীরতায় চাপের পরিমাণও অনেক বেশি, তাই চাপের প্রভাবে পাথর থাকে কঠিন অবস্থায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ব্যাসল্ট পাথরের কথা, যা সাধারণ অবস্থায় ১১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গলে যায়, কিন্তু চাপ বাড়লে (৩০,০০০ অ্যাটমসফিয়ার) সেই একই ব্যাসল্ট পাথর গলে ১৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। সুতরাং দেখা যায়, যে পাথর কঠিন চাপের বন্ধনে ভূত্বকের গভীরে রয়েছে কঠিন অবস্থায়, সেখানে প্রাকৃতিক কোন কারণে চাপ কমে গেলে সেই পাথরই পরিণত হয় গলিত পাথরে। এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে পাহাড় তৈরির কথা। ভঙ্গিল পর্বতমালার জন্মের প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝে ভূত্বকের নিচে চাপমাত্রা কমে যায়। আর একথা আগেই বলেছি, চাপমাত্রা কমে গেলে ভূত্বকের গভীরে যে তাপমাত্রা রয়েছে, সেই তাপমাত্রাতেই পাথর গলে তৈরি হয় ম্যাগমা বা আগ্নেয়গিরি। এই ম্যাগমা থেকেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় লাভা ও অন্যান্য গ্যাস তৈরি হয়ে ভূত্বকের অসংখ্য ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে উঠে আসে। ভূত্বকের গভীরে পাথর গলনের ব্যাপারে সাহায্য করে পাথরে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ অনবরত যে আনবিক রশ্মি বিকিরণ করছে তার ফলে তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত তাপ। ফলে পাথর গলনও সহজতর হয়ে উঠছে।

৯

পৌরাণিক কাহিনীতে ভূমিকম্প

ভূমিকম্প সম্পর্কে বেশ কিছু প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত। 'ভূমিকম্প কেন' এ প্রসঙ্গে একটি দেশী প্রচলিত কাহিনীর কথা বলছি। কথিত আছে, নাগরাজ বাসুকী নাকি পৃথিবীকে তাঁর ফণায় ধারণ করে রেখেছে আদি অনন্তকাল ধরে। মাথায় পৃথিবী দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে রাখতে মাঝে মাঝে আড়মোড়া ভাঙ্গে বাসুকী। আর তখনই পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের।

এতো গেল প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর কথা। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার পণ্ডিত বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থের 'ভূকম্পলক্ষণ' অধ্যায়ে ভূমিকম্পের প্রকৃতি, কারণ ও পূর্বাভাষ সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। এতে কাশ্যপ, পরাশর, গর্গ ও বশিষ্ঠ মুনিদের মূল্যবান মতামতও সংকলিত হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য বেশ কিছু দেশের পৌরাণিক কাহিনীতেও ভূমিকম্পের উল্লেখ দেখা যায়। দেবতাদের রাজা জিউস ও ক্রোনাসকে নিয়ে গ্রীসের যে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত, তাতে ভূমিকম্পের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। টাইটানদের রাজা ক্রোনাস। তার সাম্রাজ্য বিশাল। তিনি বিয়ে করেছিলেন রীয়া নামের এক সুন্দরী অপ্সরাকে। জ্যোতিষরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, রীয়ার গর্ভের সন্তানই ক্রোনালকে হত্যা করবে একদিন। এজন্য পরপর পাঁচটি সন্তানকে গিলে খেলেন ক্রোনাস। কিন্তু ষষ্ঠ সন্তানকে রীয়া গোপনে লুকিয়ে রেখে আসে ক্রীট দ্বীপে। সেই ষষ্ঠ সন্তান জিউস ক্রমে বড় হয়ে ওঠে। ক্রোনাস একদিন সবকিছু জানতে পেরে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আক্রমণ করে জিউসকে। জিউস ক্রীট দ্বীপ থেকে পালিয়ে অলিম্পাস পর্বতের শীর্ষে এসে আশ্রয় নেন। ওদিকে ক্রোনাসও তাঁর সৈন্যসামন্তদের ডেকে অলিম্পাস পর্বতের সমান উঁচু

আর একটি পাহাড় নির্মাণ করল। নাম পেলিওন পর্বত। ওদিকে রীয়া জিউসকে গোপনে খবর দিল, ভূগর্ভের নিচে বন্দী রয়েছে একশো বাহুবিশিষ্ট বহু দৈত্য। নির্দেশ পেলেই এরা ভূমিকম্প আর বজ্র সৃষ্টি করবে। এদিকে ক্রোনাস তার দলবল নিয়ে জিউসকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। আচমকা পেলিওন পাহাড় প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠল, আর সশব্দে ধসে পড়তে লাগল। ক্রমে প্রবল ভূমিকম্পের ফলে গোটা পেলিওন পাহাড়টাই ভেঙ্গে ধসে পড়ে গেল। জিউস হলেন তখন থেকে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি।

মেঘালয়ে গারো সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রাচীন কাহিনীতে পৃথিবীকে একটি সমতল চৌকো আকারের বস্তু হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। চৌকো আকারের বস্তুটি চারকোণায় সুতো-বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে। কাছেই রয়েছে একটি দুষ্টু কাঠবিড়ালী, যে সুযোগ পেলেই সুতো ধরে টান দেয়। অবশ্য কাঠবিড়ালীর হাত থেকে পৃথিবীকে পাহারা দেবার জন্য রয়েছে একজন অলস দৈত্য। অলস দৈত্যটি প্রায়ই কাজে ফাঁকি দেয়, আর সেই ফাঁকে কাঠবিড়ালী সুতো ধরে টানে। আর সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। কাজে ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসেবে দৈত্যটি অন্ধ হয়ে যায়। এখন তো কাঠবিড়ালীর পোয়াবারো। যখন তখন সুতো ধরে টান দেয়। এখন শুধু ভয়, দৈত্যের অন্ধত্বের সুযোগ ধরে কাঠবিড়ালী কখন যে দু'টো সুতো ধরে একসঙ্গে, তাহলেই তো চিত্তির ; পৃথিবী উল্টে পুরোপুরি ধ্বংস।

এক প্রাচীন জাপানী কাহিনীতে কথিত আছে, পৃথিবীর ভেতরে নাকি একটা বড় মাগুর মাছ (ক্যাট ফিস) রয়েছে, যা আচমকা প্রচণ্ড নড়াচড়া শুরু করলে জন্ম হয় ভূমিকম্পের।

১০

ভূমিকম্প কী ?

৩০শে মে, ১৯৭০। পেরুর রাজধানী লিমার প্রধান টেলিগ্রাফ

কেন্দ্রে খবর বেজে চলেছে—টরে টক্কা…টরে টক্কা। আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে…আমার হাত থর থর করে কাঁপছে…সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল…বাঁচাও…বাঁচাও। এর পরেই নাটকীয়-ভাবে টেলিগ্রাফের লাইন মৃত মানুষের মতো নীরব নিথর হয়ে গেল। লিমার অপারেটর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ইয়ুঙ্গে শহরের লাইনকে সজীব করে তুলতে পারল না। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে অপারেটর বলল—দ্য লাইন ইজ ডেড। শুধুমাত্র টেলিগ্রাফের লাইন নয়, সমস্ত পশ্চিম পেরু জুড়ে তখন মৃত্যুর বিভীষিকা। সেই ভয়ংকর ভূমিকম্পে আন্দিজ পর্বতমালার বুকে গড়ে ওঠা দু'টি ঝলমলে শহর—হুয়ারাজ ও কারাজ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া চিমবোটে ও ট্রাজিল্লো শহর দু'টিও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অন্যান্য শহর ও গ্রামের ক্ষতিও নগণ্য নয়। জানা গেছে, পেরুর এই প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম নয়। এরও প্রায় ২০০ বছর আগে ১৭৫৫ সালে লিসবনের এক ভূমিকম্পে অন্তত কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অথচ ভূমিকম্পের দিনটি ছিল পুণ্যময় 'অল সেণ্টস ডে'। বিজ্ঞানী কাণ্ট তখন বেঁচে, তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ।

পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির এই নির্মম নিষ্ঠুর খেলা নতুন নয়। ভূমিকম্পের এই ধ্বংসলীলায় পৃথিবীর বুকে বারবার ঘনিয়ে এসেছে সর্বনাশের করাল ছায়া, বিলুপ্তি হয়েছে শান্ত, স্নিগ্ধ জনপদের। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ ধনপ্রাণ হারিয়েছে নির্বিচারে, তবু প্রকৃতির লোলুপ রসনার তৃপ্তি ঘটেনি। একটি হিসেব থেকে দেখা গেছে, প্রতিবছর ভূমিকম্পের কবলে পড়ে প্রাণ হারায় প্রায় ১০,০০০ মানুষ। পৃথিবীর কয়েকটি বিধ্বংসী ভূমিকম্পে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন তার তালিকা দেওয়া হলো নিচে।

দেশ	**বছর**	**মৃত মানুষ**
শানসি (চীন)	১৫৫৬	৮,৩০,০০০

দেশ	বছর	মৃত মানুষ
মেসিনা (ইতালি)	১৯০৮	১,০০,০০০
কানসু (চীন)	১৯২০	১,০০,০০০
কানটো (জাপান)	১৯২৩	১,০০,০০০
লিসবন (পরতুগাল)	১৭৫৫	৬০,০০০
কোয়েটা (পাকিস্তান)	১৯৩৫	৩০,০০০
কাংড়া (ভারত)	১৯০৫	২০,০০০

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির কথা তো শোনা হলো, কিন্তু ভূমিকম্পের স্বরূপ কী, সেটা ঠিকঠাক মতো খোলসা হলো না। ভূমিকম্প মানে ভূমির কম্পন। অর্থাৎ ভূমি যখন কাঁপে তখনই ভূমিকম্পের জন্ম। এখানে ভূমির অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠ যখন কাঁপতে শুরু করে, তখন সত্যিই তো তার ওপর বাড়ি ঘরের দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভবপ্রায়। শুধু বাড়ি-ঘর নয়, ভূমিকম্পে কোন কিছুই প্রায় অক্ষত থাকে না। তাছাড়া ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে ভূ-প্রকৃতির রূপবদল হয়। শিলাচ্যুতি ঘটে, ভূপৃষ্ঠের বড় ফাটল তৈরি হয়, পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে আসে, ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে, ভূমি থেকে শিকড়শুদ্ধ গাছপালা উপড়ে আসে, নদীতে মাছ মরে যায়, পাখিরা অস্বস্তিতে ভোগে, ভূগর্ভ থেকে নানারকম শব্দের নির্ঘোষ শোনা যায় ইত্যাদি। এতো হলো ভূমিকম্পের বাহ্যিক বিবরণ। ভূমিকম্পের ফলে যে অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়, তার চেয়ে বেদনাময় ঘটনা আর কী ঘটতে পারে।

বাহ্যিকভাবে সব ভূমিকম্পেই বাড়িঘর ভাঙ্গে, রেললাইন উপড়ে যায়, মানুষজন প্রাণ হারায়। তবু একথা বলতেই হয়, সব ভূমিকম্পের তীব্রতা সমান নয়। সমান বিধ্বংসী নয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা সত্যি সত্যিই কতখানি, তা' পরিমাপ করার জন্য ভূ-বিজ্ঞানীরা একটি স্কেল তৈরি করেছেন সেই ১৮২৮ সালে। কোন জিনিস কতটা লম্বা, কতটা চওড়া তা' মাপবার জন্য যেমন স্কেল, ঠিক তেমনি ভূমিকম্পের

তীব্রতা মাপবার জন্য একটি স্কেল তৈরি করেন ভূবিজ্ঞানী ইগেন। এ ধরনের স্কেল এই প্রথম। ইগেন এই স্কেলে ৬ ধরণের তীব্রতার ভূমিকম্পের উল্লেখ করেন।

১. ভূকম্পনের খুব মৃদু আভাষ পাওয়া যায় এতে।

২. সামান্য কিছু লোক এ ধরণের ভূমিকম্প বুঝতে পারেন। গাছপালা আন্দোলিত হলেও ঝোলানো ঘণ্টায় কোন আওয়াজ হয় না।

৩ বেশির ভাগ লোকই ভূকম্প অনুভব করেন। বাড়ি-ঘরের দরজা-জালনা কাঁপতে থাকে, ঝোলানো ঘণ্টার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

৪. এই ধরণের ভূমিকম্প সব লোকই বেশ ভালোভাবে অনুভব করেন। ঘরের আসবাব পত্রের নড়াচড়া বুঝতে পারা যায়।

৫. বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরে। ঘরের আসবাব পত্রের নড়াচড়া বেশ ভালোমতোই অনুভব করা যায়।

৬. ঘরের আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়। বাড়ির দেওয়াল, চিমনি ভেঙ্গে যায়।

এই স্কেলের ওপর ভিত্তি করে ভূমিকম্পের যে শ্রেণী বিভাগ তা পালটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে ইতালীয় ভূবিজ্ঞানী দ্য রোসি এবং সুইস বিজ্ঞানী ফোরেল আর একটি স্কেলের পত্তন করেন ১৮৮৩ সালে। এর নাম রোসি-ফোরেল স্কেল। এই স্কেলে দশটি ভাগ (রোমান সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে)।

গ্রেড **I**
গ্রেড **II**
গ্রেড **III** } সামান্য কিছু লোক ভূমিকম্পন অনুভব করেন। ক্ষয়-ক্ষতি সামান্যই।

গ্রেড **IV**
গ্রেড **V**
গ্রেড **VI** } দেওয়াল, ছাদে ফাটল ধরে। তবে কোন প্রাণহানি হয় না।

দেশ	বছর	মৃত মানুষ
মেসিনা (ইতালি)	১৯০৮	১,০০,০০০
কানস্থ (চীন)	১৯২০	১,০০,০০০
কানটো (জাপান)	১৯২৩	১,০০,০০০
লিসবন (পরতুগাল)	১৭৫৫	৬০,০০০
কোয়েটা (পাকিস্তান)	১৯৩৫	৩০,০০০
কাংড়া (ভারত)	১৯০৫	২০,০০০

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির কথা তো শোনা হলো, কিন্তু ভূমিকম্পের স্বরূপ কী, সেটা ঠিকঠাক মতো খোলসা হলো না। ভূমিকম্প মানে ভূমির কম্পন। অর্থাৎ ভূমি যখন কাঁপে তখনই ভূমিকম্পের জন্ম। এখানে ভূমির অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠ যখন কাঁপতে শুরু করে, তখন সত্যিই তো তার ওপর বাড়ি ঘরের দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভবপ্রায়। শুধু বাড়ি-ঘর নয়, ভূমিকম্পে কোন কিছুই প্রায় অক্ষত থাকে না। তাছাড়া ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে ভূ-প্রকৃতির রূপবদল হয়। শিলাচ্যুতি ঘটে, ভূপৃষ্ঠের বড় ফাটল তৈরি হয়, পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে আসে, ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে, ভূমি থেকে শিকড়শুদ্ধ গাছপালা উপড়ে আসে, নদীতে মাছ মরে যায়, পাখিরা অস্বস্তিতে ভোগে, ভূগর্ভ থেকে নানারকম শব্দের নির্ঘোষ শোনা যায় ইত্যাদি। এতো হলো ভূমিকম্পের বাহ্যিক বিবরণ। ভূমিকম্পের ফলে যে অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়, তার চেয়ে বেদনাময় ঘটনা আর কী ঘটতে পারে।

বাহ্যিকভাবে সব ভূমিকম্পেই বাড়িঘর ভাঙ্গে, রেললাইন উপড়ে যায়, মানুষজন প্রাণ হারায়। তবু একথা বলতেই হয়, সব ভূমিকম্পের তীব্রতা সমান নয়। সমান বিধ্বংসী নয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা সত্যি সত্যিই কতখানি, তা' পরিমাপ করার জন্য ভূ-বিজ্ঞানীরা একটি স্কেল তৈরি করেছেন সেই ১৮২৮ সালে। কোন জিনিস কতটা লম্বা, কতটা চওড়া তা' মাপবার জন্য যেমন স্কেল, ঠিক তেমনি ভূমিকম্পের

তীব্রতা মাপবার জন্য একটি স্কেল তৈরি করেন ভূবিজ্ঞানী ইগেন। এ ধরনের স্কেল এই প্রথম। ইগেন এই স্কেলে ৬ ধরণের তীব্রতার ভূমিকম্পের উল্লেখ করেন।

১. ভূকম্পনের খুব মৃদু আভাষ পাওয়া যায় এতে।

২. সামান্য কিছু লোক এ ধরণের ভূমিকম্প বুঝতে পারেন। গাছপালা আন্দোলিত হলেও ঝোলানো ঘণ্টায় কোন আওয়াজ হয় না।

৩ বেশির ভাগ লোকই ভূকম্প অনুভব করেন। বাড়ি-ঘরের দরজা-জালনা কাঁপতে থাকে, ঝোলানো ঘণ্টার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

৪. এই ধরণের ভূমিকম্প সব লোকই বেশ ভালোভাবে অনুভব করেন। ঘরের আসবাব পত্রের নড়াচড়া বুঝতে পারা যায়।

৫. বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরে। ঘরের আসবাব পত্রের নড়াচড়া বেশ ভালোমতোই অনুভব করা যায়।

৬. ঘরের আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়। বাড়ির দেওয়াল, চিমনি ভেঙ্গে যায়।

এই স্কেলের ওপর ভিত্তি করে ভূমিকম্পের যে শ্রেণী বিভাগ তা পালটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে ইতালীয় ভূবিজ্ঞানী দ্য রোসি এবং সুইস বিজ্ঞানী ফোরেল আর একটি স্কেলের পত্তন করেন ১৮৮৩ সালে। এর নাম রোসি-ফোরেল স্কেল। এই স্কেলে দশটি ভাগ (রোমান সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে)।

গ্রেড I
গ্রেড II
গ্রেড III } সামান্য কিছু লোক ভূমিকম্পন অনুভব করেন। ক্ষয়-ক্ষতি সামান্যই।

গ্রেড IV
গ্রেড V
গ্রেড VI } দেওয়াল, ছাদে ফাটল ধরে। তবে কোন প্রাণহানি হয় না।

গ্রেড VII ছাদের পলেস্তারা নিচে খসে পড়ে। দু'চার জন মানুষ সামান্য আহত হতে পারে।

গ্রেড VIII
গ্রেড IX
গ্রেড X } প্রচুর মানুষজন মারা যায়। ধনসম্পতির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এই স্কেলে কয়েকটি বিভাগ এক সঙ্গেই দেখানো হয়েছে, এই বিভাগগুলি আলাদা করা হয় সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপ করে। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে পাথর কতটা জোরে কাঁপে তার তীব্রতা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।

এরপর ১৯৩১ সালে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপ করবার জন্য আর একটি স্কেল তৈরি হয়। এটি তৈরী করেছেন ভূবিজ্ঞানী উড ও নিউম্যান, মূলত চার ধরনের ইমারতের ওপর ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি দেখে। এতে ৪ ধরনের ইমারতের কথা ধরা হয়েছে।

A—ইমারত : ইস্পাত, কংক্রিট সিমেন্টের তৈরি ইমারত।

B—ইমারত : মাঝারি শক্ত ইমারত, কংক্রিট ব্যবহৃত।

C—ইমারত : মাঝারি ধরনের ইমারত।

D—ইমারত : খুবই আলগাভাবে বানানো ইমারত বা বাড়ি।

সংশোধিত মারসেল্লী স্কেল (১৯৩১)

(পুরনো মারসেল্লী স্কেলের সংশোধিত)

I. সাধারণভাবে বুঝতে পারা যায় না। দূরের কোন ভূমিকম্পই এর জন্য দায়ী। তীব্রতা ৩৫।

II. উঁচু তলায় বিশ্রামরত ব্যক্তিরাই কেবল অনুভব করতে পারেন।

III ঘরের ভেতর অনুভব করা যায়। ঝোলানো জিনিসপত্র দুলতে থাকে। তীব্রতা ৪'২।

IV ঝোলানো জিনিসপত্র দোলে। জানলা দরজা কাঁপতে থাকে।

V ঘরের বাইরেও অনুভব করা যায়। পেনডুলাম ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। গ্লাসে তরল পদার্থ থাকলে তা উছলে পড়ে।

VI সবাই অনুভব করতে পারে। লোকজনের হাঁটতে অসুবিধে হয়। চার্চ ও স্কুলের ঘণ্টা বেজে ওঠে। গাছপালা দুলতে থাকে। D—ধরনের ইমারতে ফাটল ধরে। তীর্ততা ৪৯-৫৪।

VII দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কষ্টকর। মোটর চালকরাও বুঝতে পারে। পুকুরের জল ঘোলাটে হয়ে যায়। চার্চের বড় ঘণ্টা বাজতে থাকে। C—ধরনের ইমারতে ফাটল ধরে। নদীতে বালির পাড় ভাঙ্গতে শুরু করে।

VIII মোটর চালানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। B—ধরনের ইমারতের ভাঙ্গন ধরে। কিন্তু A—ধরনের ইমারতে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। গাছের ডাল পালা ভেঙ্গে পড়ে। কুঁয়োর জল গরম হয়ে ওঠে। মিনার, উঁচু বাড়িতে ভাঙ্গন ধরে, চিমনি ভেঙ্গে পড়ে। তীব্রতা ৬·২।

IX জনসাধারণের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। D ও C ধরনের ইমারত পুরোপুরি নষ্ট হয়। B—ধরনের ইমারতে বেশ ভাঙ্গন ধরে। বাঁধ ও জলাধার খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পলিমাটি অঞ্চলে মাটি ও বালি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। তীব্রতা ৬৯।

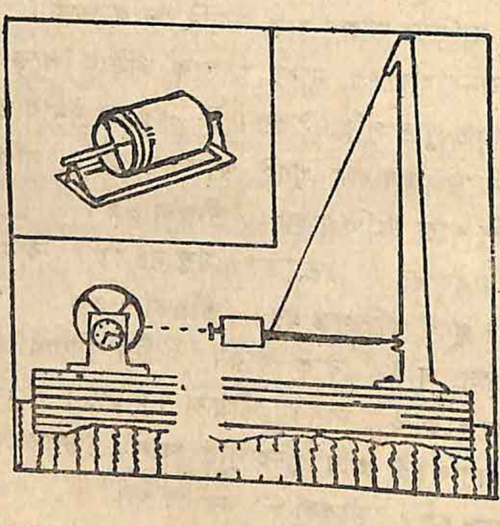
X সব ধরনের ইমারত ভিত পর্যন্ত নষ্ট হয়। বাঁধ, নদীর পাড়, ব্রিজ ইত্যাদি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তীব্রতা ৭-৭·৩।

XI রেল লাইন বেঁকে যায়। মাটির নিচের পাইপ লাইন পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায়। তীব্রতা ৭·৪-৮·১।

XII সবকিছুই প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস। ভূপৃষ্ঠ থেকে বড় বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়। তীব্রতা ৮·১ এর বেশি।

১৯৬৩ সালে এস মেডভেডেভ, ডবলিউ স্পনহিউয়ার এবং ভি কারণিক আর একটি স্কেল তৈরি করেন। এতে ভূমিকম্পের ধ্বংসের বিবরণ আর একটু বিশদভাবে দেওয়া হলেও পরে বর্ণিত স্কেলের সঙ্গে তফাৎ কমই। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে সংশোধিত মারসেল্লী স্কেলই মোটামুটিভাবে সবাই মেনে নিয়েছেন। ভূমিকম্প কেন, সে কথা বিশদভাবে আলোচনার আগে এটুকু বলা যেতে পারে ভূমিকম্পের জন্ম

ভূপৃষ্ঠের নিচে পাথরের শরীরে আলোড়নের ফলে। ভূপৃষ্ঠের নিচে যেখানে ভূমিকম্পের জন্ম, তার নাম ভূকম্পন-কেন্দ্র (focus)। তবে ভূকম্পন-কেন্দ্রের গভীরতা কতটা, তার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তবে সবচেয়ে গভীর ভূকম্পন কেন্দ্রের হদিশ পাওয়া গেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এই গভীরতা প্রায় আনুমানিক ৪৫০ মাইল। ভূপৃষ্ঠে যে স্থানের নিচে ভূকম্পন-কেন্দ্র, তার নাম এপিসেণ্টার (epicentre) বা উপকেন্দ্র। ভূকম্পের ফলে পাথরের শরীরে যে কাঁপুনি শুরু হয়, তার তীব্রতা মাপা হয় সিসমোগ্রাফ (seismograph) যন্ত্রে। বেশ কয়েকটি স্থান থেকে সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে পরিমাপ করা পাথরের কম্পন থেকে কোন ভূমিকম্পের ভূকম্পন-কেন্দ্র ঠিক করা যায়।



বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোন ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপতে গেলে সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি, এফ, রিকটার সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল একটি স্কেল চালু করছেন ১৯৩৫ সালে। এতে দশটি ভাগ। এই স্কেলে ভূপৃষ্ঠের ওপরে ধ্বংসলীলার পরিবর্তে ভূমিকম্পের প্রকৃত তীব্রতা বা শক্তির পরিমাপ করা হয়। কোন ভূমিকম্পের তীব্রতা

বোঝাতে এখনো সবাই রিকটার স্কেল ব্যবহার করেন। এই স্কেলে উপকম্পন-কেন্দ্র থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরের কোন সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা-পড়া পাথরের কম্পন থেকে ভূমিকম্পের তীব্রতা ঠিক করা হয়। খুব সাধারণ ধরনের মৃদু ভূমিকম্পের মাপ এই স্কেলে ১·৫ থেকে ২ হতে পারে। আর ভয়ংকর বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ৮·৫ থেকে ৯। ১৮৯৭ সালে আসামে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছিল, রিকটায় স্কেলে তার মাপ ৮·৫। আর ১৯৬২ সালের ইরানের ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল আরো বেশি, রিকটার স্কেলে প্রায় ৯-এর কাছাকাছি।

ভূকম্পন কেন্দ্রের গভীরতা কতখানি? সাধারণভাবে বলতে হয়, অধিকাংশ ভূমিকম্পের ভূকম্পন কেন্দ্রের গভীরতা খুবই কম। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ মিটারের মধ্যে। মাঝারি গভীরতার ভূকম্পন কেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায় ৩০ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে। এর চেয়ে বেশি গভীরতার ভূকম্পন-কেন্দ্র প্রকৃতিতে সত্যিই বিরল। আগেই বলেছি ৪৫০ কিলোমিটার গভীরতার ভূকম্পন কেন্দ্র পৃথিবীতে মাত্র এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নিচের তালিকায় কতগুলি ভূমিকম্পের সময় ও তীব্রতা (রিক্টার স্কেল অনুযায়ী) উল্লেখ করা হলো।

অঞ্চল/দেশ	সময়	তীব্রতা
কানটো, জাপান	১৯২৩	৭·৯
হোলিস্টার, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৯৬০	৫·০
কোরালিটস	১৯৬৪	৫·২
শেকিহারা, জাপান	১৯৪৪	৮·০
নাগায়োকা	১৯৬১	৫·২
নর্থ মিনো	১৯৬১	৭·০
নিইগাতা	১৯৬৪	৭·৫
ডুনাহারাজতি, হাঙ্গেরি	১৯৫৬	৬·০
তাশখেণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া	১৯৬৬	৫·৫

অঞ্চল/দেশ	সময়	তীব্রতা
গার্ম	১৯৬৯	৫·৭
সান ফারনানডো, আমেরিকা	১৯৭১	৬·৪
আজিকাজায়া, জাপান	১৭৯৩	৬·৯
সাদো	১৮০২	৬ ৬
হামাদা	১৮৭২	৭·১
ট্যাঙ্গো	১৯২৭	৭·৫
টোটোরি	১৯৪৩	৭ ৪
টোনানকাই	১৯৪৪	৮ ০
নানকি	১৯৫০	৬·৭
দাইশোজি-ওকি	১৯৫২	৬·৮
ইয়োশিনো	১৯৫২	৭ ০
ও দাইগাহারা	১৯৬০	৬ ০
হুইগানাদা	১৯৬১	৭·০
শিরাহামা-ওকি	১৯৬২	৬·৪
একিজেন মিসাকি-ওকি	১৯৬৩	৬·৯
আশখাবাদ, সোভিয়েট রাশিয়া	১৯৫৭	৪ ০
আলমা আতা	১৯৫৮	৪·০
আফগানিস্তান	১৯৫৯	৫·০
ফুকই, জাপান	১৯৪৮	৫ ০
মাতসুশিরো	১৯৬৬	৪ ৬
হিন্দুকুশ	১৯৬৫	৭·৫
পামির	১৯৬৯	৩ ০
চিলি	১৯৬০	৮·৩
সেডন, নিউজিল্যাণ্ড	১৯৬৬	৬·১
কামচাটকা, সোভিয়েট রাশিয়া	১৯৫৯	৭·৮
সিটকা, আলাসকা	১৯৭২	৭·২

১১

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিকম্পের বিবরণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যে ভূমিকম্প হয়েছে, তারই একটি তালিকা দেওয়া হলো। এতে অবশ্য ভারতের হিসেব ধরা হয়নি।

চীন ঃ ১০৫৭, ১২৯০, ১৫৫৬, ১৯২০, ১৯৩২, ১৯৬৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৯

জাপান ঃ ১২৯৩, ১৫২৮, ১৭০৩, ১৯২৩, ১৯৪৬, ১৯৪৮, ১৯৭৮

ইরান ঃ ১৭৭৫, ১৯৫৭, (উত্তর ইরান), ১৯৫৭ (পশ্চিম ইরান), ১৯৬২, ১৯৬৮, ১৯৭৮, ১৯৭৯

তুর্কী ঃ ১২৬৮, ১৮২২, ১৯৩৯, ১৯৪৬, ১৯৫৩, ১৯৭১

চিলি ঃ ১৯০৬, ১৯৩৯, ১৯৬০, ১৯৬৫

পেরু ঃ ১৮৬৮, ১৯৭০

ইকুয়েডর ঃ ১৭৯৭, ১৮৬৮, ১৯৪৯

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ ১৮১১-১২, ১৯০৬, ১৯৬৪, ১৯৭৯

ইতালি ঃ ১৬৯৩, ১৭৮৩, ১৯০৮, ১৯১৫

পর্তুগাল ঃ ১৫৩১, ১৭৭৫

গ্রেট ব্রিটেন ঃ ১৫৮০, ১৬৯২, ১৭০৮, ১৭৫০, ১৮১৬, ১৮৮৪

চীন জাপান কিংবা তুর্কীর প্রাচীন ভূমিকম্পের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। স্মরণীয় কালের যে ভূমিকম্পের কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়, তা' হলো ১৫৮০ সালে ইংলণ্ডের ভূমিকম্প। বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ারের তখনো ষোল বছর পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া তিনি তখনো বিখ্যাত হয়ে ওঠেন নি, লণ্ডনে যান নি তখনো। তাই ভূমিকম্প স্বচক্ষে দেখেন নি তিনি, কেবল শুনেছেন লোকমুখে। লোকমুখে শোনা এই ভূমিকম্পের কথা তিনি বসিয়ে দিয়েছেন

'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের একটি চরিত্রের মুখে, 'It is since the Earth quake now eleven years'। সে যাই হোক না কেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে তা ইংলিশ চ্যানেলের অন্য পাশের দেশ ফ্রান্স ও বেলজিয়ামেও অনুভব করা গিয়েছিল। লণ্ডনের বাইরে স্যাণ্ডউইচ, কেণ্ট ইত্যাদি জায়গায় যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এই ভূমিকম্পের ফলে।

এরপর মাঝে মধ্যেই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে ইংলণ্ড। ১৭৫০ সালে লণ্ডনে পরপর পাঁচবার ভূমিকম্পের ধাক্কায় লণ্ডন ছেড়ে পালাবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, হাইড পার্কে প্রায় এক লাখ মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভূমিকম্পের কবল থেকে বাঁচতে। তবে ব্রিটেনে সবচেয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয় ১৮৮৪ সালে, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য বিধ্বংসী ভূমিকম্পের তুলনায় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় ১৭৫৫ সালে, তা' পৃথিবীর ইতিহাসে এক ভয়ংকর দুর্যোগ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। শুধু ভূমিকম্প নয়, ভূমিকম্পের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসেছিল আগুন ও বন্যা, যা অসহায় মানুষকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে তা' দক্ষিণে মরক্কো, উত্তরে সুইডেন ও পুবে জার্মানী পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই অনুভব করা গেছে। মরক্কোতে এই ভূমিকম্পে বেশ কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। এই ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা মানুষের মনে ধর্মভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ধর্মযাজকরা অনেকেই সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, মানুষের পাপের ফল এই ভয়াবহ ভূমিকম্প। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সবাইকে। যদিও তখন প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন মানুষের পাপের সঙ্গে ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক নেই। ভূস্তরে শিথিলতার জন্যই এই ভূমিকম্প। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

সুইজারল্যাণ্ডে একদিন গণ-অনশন দিবস পালিত হলো ঈশ্বরের কৃপালাভের আশায়। গ্রেট ব্রিটেনেও গণ-অনশন করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হলো, কেননা ভূমিকম্প থেকে গ্রেট ব্রিটেনকে এবারের মতো রক্ষা করেছেন ঈশ্বর।

অথচ ভূমিকম্পের দিন ১লা নভেম্বর (১৭৫৫) সকালবেলা সোনালী রোদ্দুরে ঝকঝক করছিল চারিদিক। কিন্তু সকাল দশটার মধ্যেই ঘনিয়ে এলো লিসবনের জীবনের সবচেয়ে করুণ সময়টি। একটি চার্চে সবাই উপাসনার প্রস্তুতি করছিলেন। এমন সময় প্রধান ধর্মযাজক দেখলেন, তাঁর গীর্জাটি সমুদ্রের বুকে জাহাজের মতো দুলছে। মুহূর্তের মধ্যে ওপর থেকে কড়ি বরগা ভেঙে পড়ল তাঁর মাথায়। মারা গেলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। স্পেন দেশীয় অ্যামবাসাডার তাঁর বাড়ির বাগানে বেরোতে গিয়ে পাথর চাপা পড়ে মারা যান।

প্রথম দিন পরপর তিনবার বড় রকমের কম্পন অনুভব করা যায়। তাছাড়া অগুনতি বার শোনা যায় গুড়গুড় শব্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় কম্পনের মধ্যে সময়ের তফাৎ ছিল ২০ মিনিটের। দ্বিতীয় কম্পনটি স্থায়ী ছিল প্রায় তিন মিনিট। ভূমিকম্পের সময় বন্দরে নোঙ্গর করা একটি জাহাজ থেকে মনে হচ্ছিল, পাহাড়ী শহর লিসবনও যেন আর একটি জাহাজ। সমুদ্রের ঢেউয়ে একবার উঠছে, আর একবার নামছে। অন্যদিকে লিসবনের মানুষজনদের মনে হচ্ছিল, সমুদ্র ফুলে ফেঁপে বিশাল এক পাহাড়ের মতো তটদেশে আছড়ে পড়ল। একবার দু'বার নয়, তিন তিনবার এভাবে সমুদ্রের ঢেউ আক্রমণ হানল তটদেশ অঞ্চলে। সমুদ্রের ঢেউয়ের টানেই ভেসে গেল কত শত মানুষ।

দ্বিতীয় কম্পনের প্রায় ২ ঘণ্টা পরে তৃতীয় কম্পনের ধাক্কা এলো। এভাবে পরপর তিন-তিনটি কম্পনে লিসবন শহর নেতিয়ে পড়ল পুরোপুরি। পথে, ঘাটে, ভগ্নস্তূপের মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ কিংবা আহত ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য সময় গুনছে। এই মৃত্যুশীতল আবহাওয়ার

'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের একটি চরিত্রের মুখে, 'It is since the Earth quake now eleven years'। সে যাই হোক না কেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে তা ইংলিশ চ্যানেলের অন্য পাশের দেশ ফ্রান্স ও বেলজিয়ামেও অনুভব করা গিয়েছিল। লণ্ডনের বাইরে স্যাণ্ডউইচ, কেণ্ট ইত্যাদি জায়গায় যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এই ভূমিকম্পের ফলে।

এরপর মাঝে মধ্যেই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে ইংলণ্ড। ১৭৫০ সালে লণ্ডনে পরপর পাঁচবার ভূমিকম্পের ধাক্কায় লণ্ডন ছেড়ে পালাবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, হাইড পার্কে প্রায় এক লাখ মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভূমিকম্পের কবল থেকে বাঁচতে। তবে ব্রিটেনে সবচেয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয় ১৮৮৪ সালে, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য বিধ্বংসী ভূমিকম্পের তুলনায় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় ১৭৫৫ সালে, তা' পৃথিবীর ইতিহাসে এক ভয়ংকর দুর্যোগ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। শুধু ভূমিকম্প নয়, ভূমিকম্পের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসেছিল আগুন ও বন্যা, যা অসহায় মানুষকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে তা' দক্ষিণে মরক্কো, উত্তরে সুইডেন ও পুবে জার্মানী পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই অনুভব করা গেছে। মরক্কোতে এই ভূমিকম্পে বেশ কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। এই ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা মানুষের মনে ধর্মভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ধর্মযাজকরা অনেকেই সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, মানুষের পাপের ফল এই ভয়াবহ ভূমিকম্প। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সবাইকে। যদিও তখন প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন মানুষের পাপের সঙ্গে ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক নেই। ভূস্তরে শিথিলতার জন্যই এই ভূমিকম্প। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

সুইজারল্যাণ্ডে একদিন গণ-অনশন দিবস পালিত হলো ঈশ্বরের কৃপালাভের আশায়। গ্রেট ব্রিটেনেও গণ-অনশন করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হলো, কেননা ভূমিকম্প থেকে গ্রেট ব্রিটেনকে এবারের মতো রক্ষা করেছেন ঈশ্বর।

অথচ ভূমিকম্পের দিন ১লা নভেম্বর (১৭৫৫) সকালবেলা সোনালী রোদ্দুরে ঝকঝক করছিল চারিদিক। কিন্তু সকাল দশটার মধ্যেই ঘনিয়ে এলো লিসবনের জীবনের সবচেয়ে করুণ সময়টি। একটি চার্চে সবাই উপাসনার প্রস্তুতি করছিলেন। এমন সময় প্রধান ধর্মযাজক দেখলেন, তাঁর গীর্জাটি সমুদ্রের বুকে জাহাজের মতো দুলছে। মুহূর্তের মধ্যে ওপর থেকে কড়ি বরগা ভেঙে পড়ল তাঁর মাথায়। মারা গেলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। স্পেন দেশীয় অ্যামবাসাডার তাঁর বাড়ির বাগানে বেরোতে গিয়ে পাথর চাপা পড়ে মারা যান।

প্রথম দিন পরপর তিনবার বড় রকমের কম্পন অনুভব করা যায়। তাছাড়া অগুনতি বার শোনা যায় গুড়গুড় শব্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় কম্পনের মধ্যে সময়ের তফাৎ ছিল ২০ মিনিটের। দ্বিতীয় কম্পনটি স্থায়ী ছিল প্রায় তিন মিনিট। ভূমিকম্পের সময় বন্দরে নোঙ্গর করা একটি জাহাজ থেকে মনে হচ্ছিল, পাহাড়ী শহর লিসবনও যেন আর একটি জাহাজ। সমুদ্রের ঢেউয়ে একবার উঠছে, আর একবার নামছে। অন্যদিকে লিসবনের মানুষজনদের মনে হচ্ছিল, সমুদ্র ফুলে ফেঁপে বিশাল এক পাহাড়ের মতো তটদেশে আছড়ে পড়ল। একবার দু'বার নয়, তিন তিনবার এভাবে সমুদ্রের ঢেউ আক্রমণ হানল তটদেশ অঞ্চলে। সমুদ্রের ঢেউয়ের টানেই ভেসে গেল কত শত মানুষ।

দ্বিতীয় কম্পনের প্রায় ২ ঘণ্টা পরে তৃতীয় কম্পনের ধাক্কা এলো। এভাবে পরপর তিন-তিনটি কম্পনে লিসবন শহর নেতিয়ে পড়ল পুরোপুরি। পথে, ঘাটে, ভগ্নস্তূপের মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ কিংবা আহত ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য সময় গুনছে। এই মৃত্যুশীতল আবহাওয়ার

মধ্যে কিছু কিছু ধর্মযাজক মৃত্যু পথযাত্রী মানুষদের কাছ থেকে শেষ স্বীকারোক্তি পাঠ করিয়ে নিচ্ছেন। ধর্মযাজকরা বলছিলেন, মানুষের সীমাহীন পাপের ফলেই এই ভূমিকম্প। সুতরাং ঈশ্বরের সব দোষ কবুল করে কৃপা ভিক্ষা করাই বাঁচবার একমাত্র পথ। এদিকে মুমূর্ষু আহত মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভরে উঠল। গীর্জায় একদিকে আহত মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা হলো, অন্যদিকে একই সঙ্গে চলছিল সমবেত প্রার্থনা সভা। লিসবনের মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৪০ হাজারে। যদিও প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। তাছাড়া অন্যান্য ধ্বংসের পরিমাণ বর্ণনাতীত। বিশাল ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ, অসংখ্য গীর্জা, বহু বিলাসবহুল প্রাসাদ, স্কুল, লাইব্রেরি সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আগুন ও ভূমিকম্পে। সারা লিসবনের যে বাড়িটি রক্ষা পেয়েছিল তা' হলো পর্তুগালের টাঁকশাল। শুধু তাই নয়, টাঁকশালের কর্মচারী ও অফিসাররা অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে এটিকে রক্ষা করেছেন ডাকাত ও চোরের হাত থেকে।

সর্বনাশ ভূমিকম্পের পরে দেখা গেল লিসবন শহরে জীবিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ। তবে তারা, সবাই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন। তাদের মাথার ওপর কোন ছাদ বা আচ্ছাদন নেই। তারা সবাই ফিরে গিয়েছিল এক আদিম সমতায়, যেখানে কেউ ধনী বা গরীব নয়, কেউ শাসক বা শোষিত নয়। তারা সবাই মেঘাচ্ছন্ন নির্মম আকাশের নিচে সমান অসহায়।

সরকারী ব্যবস্থা প্রথম দিকে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়লেও ক্রমে পুনর্বাসনের কাজে নেমে পড়ে। শহরকে বারোটি ভাগে ভাগ করে ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। এই প্রশাসনের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল শহরের সমস্ত অধিবাসীর জন্য রান্না করা খাবারের বন্দোবস্ত করা, মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়া এবং রোগ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। ভূমিকম্পের এই বিপর্যয়ের মধ্যে লুঠতরাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। লুঠেরা দস্যুরা গীর্জার সেবিকার পোষাক পরে সাধারণ মানুষকে

ধোঁকা দিচ্ছিল। কিন্তু প্রশাসনের দৃঢ়তায় এদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়ে, বিচারে প্রচণ্ড শাস্তি হয়। এই ভূমিকম্পে অর্থের দিক থেকে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮১ লক্ষ পাউণ্ড (তৎকালীন মুদ্রার দাম অনুযায়ী), যদিও এই হিসেবের ভগ্ন বাড়ির হিসেব ধরা হয়নি।

ভূমিকম্পের প্রকৃত কারণ কী, তাই নিয়ে যুক্তিবাদীদের সঙ্গে ঈশ্বরবাদীদের তুমুল বিতর্ক বেধে গেল। এই তর্কের নিষ্পত্তির জন্য সেনর দ্য কার্ভালো বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকম্পের কারণ কী তা' নির্ণয় করতে অনুরোধ করলেন। এর ফলে ভূবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো। এই তথ্য উত্তরকালে বিজ্ঞানীদের বহু কাজে লেগেছে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেল ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর জিবরালটারে দুর্গের কামান ভূমিকম্পের কাঁপুনিতে বারবার ওঠানামা করেছে। ওদিকে ঐ সময়ে মরক্কোর ভূমিকম্পে প্রাণ হারায় বেশ কয়েক হাজার মানুষ। লিসবন থেকে প্রায় ৩৫০০ মাইল দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে সমুদ্রের বিশাল ঢেউ পৌঁছে যায় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। একই সময়ে সুইডেন, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও গ্রেট বিটেনের সমুদ্র প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

তবু এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও গ্রেট ব্রিটেন লিসবনের ভূমিকম্পে নিজেদের একাত্ম বোধ করেছে। তাঁরা সাহায্য পাঠিয়েছে ৫০,০০০ পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা, অজস্র মদ, মাখন, গম, চাল, ময়দা, বিস্কুট, প্রচুর জুতো ও বেশ কিছু গাঁইতি, শাবল ও বেলচা।

এই ভূমিকম্প সমসাময়িক সময়ে এতটা উত্তেজনা ও আবেগের সৃষ্টি করেছিল যে বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক ভলতেয়ার তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কাঁদিদ'এ লিসবন ভূমিকম্পের বিবরণ দিয়েছেন পুংখানুপুংখ-ভাবে। কাহিনীর নায়ক পর্যটন করে বেরিয়েছে ভূমিকম্পে পর্যুদস্ত অঞ্চলে।

১৭৮৩ সালে দক্ষিণ ইত্যালির ক্যালাব্রিয়ায় যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, তাতে প্রায় ৮০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তাছাড়া

ভূমিকম্পের পর যে মহামারী দেখা দেয় তাতে আরো প্রায় ১৯ হাজার মানুষ মারা পড়ে। এই ভূমিকম্প সম্পর্কে বিশদ ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালান এক বিশেষজ্ঞ দল। এই দলে ছিলেন স্যাঁর উইলিয়াম হ্যামিল্টন, ফরাসী ভূবিজ্ঞানী ডিয়োডেটাস দ্য ডলোমিউ, আরো জনা পনেরো বিজ্ঞানী ও একজন ছবি আঁকিয়ে শিল্পী। তখনকার দিনে ক্যামেরা আবিষ্কার হয়নি বলে ছবি আঁকিয়ে শিল্পীদের খুবই প্রয়োজন হতো এসব কাজে। সমীক্ষায় প্রকাশ পেল, ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী অঞ্চলে বিশাল ধস নেমেছিল। তাছাড়া এই ভূমিকম্পের ফলে তৈরি হয়েছিল নতুন পাহাড়, উপত্যকা ও প্রস্রবণ। এই ভূমিকম্পে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় মেসিনা ও রেগিয়ো শহর দু'টি। এই ভূমিকম্প সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন হ্যামিল্টন ও ডলোমিউ। বলতে গেলে ভূমিকম্প সম্পর্কে এটিই প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ। মেসিনায় আবার ভূমিকম্প হয় ১৯০৮ সালে।

এরপর ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বরে নেপলস শহরের আশেপাশের অঞ্চল এক ভীষণ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। এই ভূমিকম্পে মণ্টেস্মুরো শহরের ৭০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৫০০০ মানুষই প্রাণ হারায়। এই ভূমিকম্প সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা চালান একজন আইরিশ ভূতাত্ত্বিক। নাম রবার্ট ম্যালেট।

ভূমিকম্পের দিক থেকে ১৮৮৩ সাল পৃথিবীর পক্ষে একটি অশুভ বছর। সেবছর ইরাণ ও গ্রীসে ভূমিকম্প হয়েছে, নেপলসের কাছে ইসছিয়া দ্বীপ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পে আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু জাভা ও সুমাত্রার ক্রাকাতোয়ায় যে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয় ১৮৮৩ সালের ২৬-২৭ আগস্ট, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই বিস্ফোরণের ফলে সমুদ্রের ঢেউ ১৩৫ ফিট উঁচু হয়ে সুন্দা প্রণালীর দু'পাশে জাভা ও সুমাত্রার সব গ্রাম ও শহরকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ক্রাকাতোয়া ও আশেপাশের দ্বীপগুলির তিনভাগের দু'ভাগ অঞ্চল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। ক্রাকাতোয়া দ্বীপের বদলে শুধু ছিল

এক হাজার ফিট গভীর সমুদ্রের নিচে এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ভূমিকম্পের মূল বিস্ফোরণের শব্দ প্রায় ৩০০০ মাইল দূর থেকেও শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। শব্দের তীব্রতার দিক থেকে এটি বিশ্ব রেকর্ড।

জাভা সুমাত্রা দ্বীপ আগ্নেয়গিরিতে গিজগিজ করছে। এই সামান্য জায়গার মধ্যে ৪৯টি আগ্নেয়গিরি, এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই সজীব। এদের মধ্যে কয়েকটির উচ্চতা ১২০০০ ফিটের মতো। এই অঞ্চলটি একই সঙ্গে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি—উভয় বলয়ের মধ্যে পড়ে। ক্রাকাতোয়া দ্বীপটি লম্বায় ৪ মাইল, শীর্ষদেশ প্রায় ২৬০০ ফিট উঁচু। পাহাড়ী ঢাল ঘন জঙ্গলে ভর্তি। লোকজন কেউ থাকে না, কেবল মাঝে মাঝে জাপানী জেলেরা মাছ ধরতে আসে। এই দ্বীপটি আসলে একটি আগ্নেয়গিরি।

ক্রাকাতোয়ায় অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই যে রাজধানী বাটাভিয়াও (জাকার্তা) বারবার কেঁপে উঠছিল। মানুষ-জনও আতংকে বাস করেছে বহুদিন। এরপর আবার ভূমিকম্প হয় ১৯৫০ সালে।

বার কয়েক ছোটখাট ভূমিকম্প হলেও বড় আকারের ভূমিকম্প আলাসকায় প্রথম নজরে আসে ১৮৯৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ-পূর্ব আলাসকায় ইয়াকুটাট উপসাগরীয় অঞ্চলে। আলাসকায় এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে ভূমিকম্প হলেও এই জনবিরল অঞ্চলে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি তেমন হতে পারেনি। তবে এই ভূমিকম্পের ভূতাত্ত্বিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন ভূমিকম্পে ভূমিখণ্ডের এতটা পতন বা উত্থান দেখা যায়নি। দেখা গেছে, সমুদ্রতটের কাছে জায়গায় জায়গায় ভূমিখণ্ড প্রায় ৪৭ ফিট ওপরে উঠে এসেছে। এই ভূমিকম্প আলাসকায় হিমবাহগুলিকে যথেষ্টই বিপর্যস্ত করেছে। তটদেশীয় অঞ্চলের মুইর হিমবাহের অগ্রভাগ ভূমিকম্পের ফলে ভেঙ্গে

চুরমার হয়ে সমুদ্রে বহু ভাসমান হিম-শৈল (ice-berg) তৈরি করেছে। ইয়াকুটাট উপসাগরের কাছে যে হিমবাহ ছিল, তা' ভেঙ্গেও বহু হিম-শৈল তৈরি হয়েছে। কিন্তু নিকটবর্তী ইলিয়াস পাহাড় থেকে অন্য হিমবাহ ভেঙ্গে নেমে এসে ক্ষতিপূরণ করে দেয়। এর ফলে হিমবাহের চলার গতি বেড়ে যায় ভয়ংকর ভাবে। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে তার দাপটে প্রায় নিষ্ক্রিয় ম্যালাসপিনা হিমবাহও সচল হয়ে ওঠে। ফলে ঐ হিমবাহের ওপর গড়ে ওঠা অরণ্যও ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল সানফ্রানসিসকোয় যে ভয়ংকর ভূমিকম্প তা উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে ভূকম্পন বিষয়ে গবেষণার জন্য। এই ভূমিকম্পে সানফ্রানসিসকোর মতো বড় শহরও অন্যান্য বহু ছোট শহর, যেমন সানটা রোসা, পালো অলটো, সান জোস ইত্যাদি ভয়ংকর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নরম আলগা মাটির ওপর তৈরি করা সব বাড়ি ভগ্নপ্রায়, যদিও শক্ত পাথরের ওপর তৈরি করা বাড়ি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। রাস্তাঘাট, ফুটপাত, জলের, পাইপ, ইলেকট্রিক লাইন সব ভেঙ্গে ফুটিফাটা। বহু জায়গায় আগুন লেগে গিয়েছিল, দমকল বাহিনী বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তা' নেভাতে পারেনি। শহরের জনজীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত। প্রায় ৭০০ মানুষ প্রাণ হারায় এই ভূমিকম্পে। 'ভূসিকম্প কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সানফ্রানসিসকো ভূসিকম্পের বিশদ সমীক্ষা চালিয়েছেন। এই ভূমিকম্পের মূল কারণ ৬০০ মাইল দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে শিলাচ্যুতি। এই শিলাচ্যুতির নাম সান আনড্রিয়াস চ্যুতি (San Andreas fault)। উত্তরে পয়েন্ট এরেনা থেকে শুরু করে সানফ্রানসিসকো শহর হয়ে দক্ষিণ পূর্বে কলোরাডো মরুভূমি পর্যন্ত প্রসারিত এই শিলাচ্যুতি রেখা। ভূমিকম্পের ফলে সমতলভূমিতে প্রায় ২১ ফিট পর্যন্ত বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে বিচ্যুতি অনেক কম। যে দীর্ঘ রেখায় এই শিলাচ্যুতি ঘটেছে, সেই রেখার কাছে

রাস্তাঘাট বেঁকে গেছে, নদীর গতিপথ বদলে গেছে, তৈরি হয়েছে উপত্যকা। সানফ্রানসিসকোর এই ভূমিকম্প প্রায় ২৫ হাজার বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়, যার অর্থমূল্য প্রায় ৩৫ কোটি ডলার, বীমা কোমপানির ক্ষতিপূরণ ২৪ কোটি ডলার। বিভিন্ন কোম্পানিগুলির মোট মূলধনী ক্ষতি হয় প্রায় ২৭ কোটি ডলার। তবে এই হিসেবগুলি নিতান্তই আনুমানিক, প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্ভবত অনেক বেশি।

১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জাপানের কোয়ানটো অঞ্চলে যে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়, মানুষের প্রাণহানির দিক থেকে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই ভূমিকম্পে মানুষ মারা গেছে লক্ষাধিক, প্রায় ৫০ হাজার ব্যক্তি আহত। মৃত্যুর এই ভয়াবহতা একমাত্র অতিক্রম করেছে হিরোশিমায় আণবিক বোমার নিক্ষেপ, যার ফলে মারা গিয়েছিল প্রায় ৮০ হাজার মানুষ। কিন্তু আণবিক তেজস্ক্রিয়তার ফলে আরো প্রায় ৬০ হাজার মানুষ বিকলাঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায়। কিন্তু এই আণবিক দুর্যোগ মানব-সৃষ্ট, কোয়ানটো অঞ্চলের ভূমিকম্প প্রকৃতি-সৃষ্ট। এই ভূমিকম্পে যে দু'টি শহর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তা' হলো ইয়োকোহামা বন্দর ও টোকিয়ো শহর। ভূমিকম্পের শুরু একঘেয়ে গুড়গুড় শব্দ দিয়ে, যা মনে হচ্ছিল, অনেক দূর থেকে আসছে। তিনবার ভীষণভাবে ভূকম্পন অনুভব করা যায় এবং পরে দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা ধরে একটানা ১৭১ বার ছোট আকারের ভূকম্পন ধরা পড়ে ভূ-কম্প মাপক যন্ত্রে (Seismograph)। ভূমিকম্পের প্রথম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে টোকিয়োয় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভীত মানুষ ঘর বাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ি ঘর, রাস্তা, বিদ্যুতের লাইন, গ্যাসের পাইপ, কলের পাইপ, টেলিগ্রাফ—সবকিছু ভেঙ্গে একাকার। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ যেখানে দলে দলে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল, তা' হলো প্রশস্ত রাজপথ ও উদ্যান। ইয়োকোহামা বন্দর-শহরেরও একই অবস্থা। ভূমিকম্পের

একটু পরেই শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়ায়। এই ঝড়ো হাওয়ার দাপটে টোকিয়ো ও ইয়োকোহামা শহরে আগুন লেগে যায়। একদিকে ভূমিকম্প, অন্যদিকে আগুন—এই দুয়ের মাঝে মানুষের অবস্থা ভয়াবহ। কত মানুষ যে বাড়ি চাপা পড়ে আর আগুনে পুড়ে মারা গেল তার ঠিক ঠিকানা নেই। শহরের প্রায় আশি ভাগ ঘরবাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ভূমিকম্পে। অবস্থা সামাল দিতে দিন কয়েকের মধ্যেই টোকিয়ো ইয়োকোহামা শহরে সামরিক আইন চালু হয়। ভূমিকম্পের যে ক্ষয়ক্ষতি, জীবননাশ হয়, তার জন্য জীবন বীমা কোম্পানিগুলো প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেয়।

স্মরণীয়কালের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে সব ভূমিকম্প হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তুর্কমেন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের রাজধানী আশখাবাদে ১৯৪৮ সালের ভূমিকম্প। কেউ কিছু বোঝবার আগে ৬ই অক্টোবর রাতে হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আশখাবাদ শহর। অবশ্য ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল শহরের ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। এই ভূমিকম্পের ফলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয় সুদীর্ঘ ফাটল। এইসব ফাটলের কোন কোনটা লম্বায় প্রায় একশো-দেড়শো মিটার। পাহাড় উপত্যকা দুভাগ করে চলে গেছে যদিও এর মধ্যে ভূমিচ্যুতি এক-দেড় মিটারের বেশি ঘটেনি। কোথাও কোথাও ফাটল বেয়ে নিচের থেকে উঠে এসেছে জল, সঙ্গে মাটি আর বালি। মনে হচ্ছিল যেন কাদা-আগ্নেয়গিরির (**mud-volcano**) জন্ম হয়েছে। এই ভূমিকম্পের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কারাগৌদান গ্রামের। এখানে একটি বাড়িও আস্ত ছিল না। এমন কি আশখাবাদ শহরেরও সব বাড়ি কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও দেখা গেছে মাটির একতলা বাড়িগুলো খণ্ড খণ্ড ইঁটে পরিণত হয়েছে। তবে যেসব বাড়ি সম্ভাব্য ভূমিকম্পের জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে তৈরি হয়েছিল, সেগুলি মোটামুটি রক্ষা পেয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় জাদুঘর,

স্টেট ব্যাংক, কাপড়ের মিল ইত্যাদি। আধুনিক বড় কোন শহরে ভূমিকম্প হলে সাধারণত আগুন লেগে যায়। কিন্তু আশখাবাদে তেমন কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি। এর কারণ হয়তো এই, আশখাবাদ শহরে কাঠের বাড়ি ছিল না। তাছাড়া রাতে ভূমিকম্প হওয়ার ফলে কারো বাড়িতেই জ্বলন্ত উনুন বা স্টোভ ছিল না। ভূমিকম্প হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের অঞ্চল থেকে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠানো হয়। আহত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় দ্রুত। ভূমিকম্পের পরে আশখাবাদ শহর আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়। তবে এবার যে বাড়িগুলি বানানো হয়, তার প্রত্যেকটিতে সম্ভাব্য ভূমিকম্প-নিরোধক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আধুনিক আশখাবাদ আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ও মনোরম।

শুধু আশখাবাদের ভূমিকম্প নয়, সোভিয়েট রাশিয়াতে আরো বহুবার ভূমিকম্প হয়েছে।

মরক্কোর সমুদ্র-তীরবর্তী আগাদির শহরে ১৯৬০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি যে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়, তাতে শহরের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষই প্রাণ হারায়। এই ভূমিকম্পের একটি বিশেষত্ব উপকেন্দ্রকে ঘিরে ছোট একটি অঞ্চল জুড়েই কেবল ভূমিকম্পের কাঁপুনি প্রচণ্ডভাবে অনুভব করা গেছে। অথচ উপকেন্দ্র থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে ভূমিকম্পের তেমন কোন রেশ অনুভব করা যায় নি।

১৯৭৮ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে উত্তর-পূর্ব ইরাণে যে সর্বনেশে ভূমিকম্প হয় তাতে অন্তত ১৫-১৬ হাজার মানুষ মারা যায়। এই ভূমিকম্পের ফলে খোরাসান প্রদেশের তাবাশ শহর ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চল প্রচণ্ডভাবে গড়ে ওঠে এবং তারপর তাসের ঘরের মতো সব ছত্রাখান হয়ে যায়। বাইরের পৃথিবীতে সেদিন যে খবর পৌঁছেছিল, তাতে লেখা ছিল, 'ধ্বংস অতি বিপুল। এককোঁটা জল নেই। বিদ্যুৎ নেই। ডাক্তার নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অবস্থা মর্মন্তুদ।' ভূকম্পলেখ যন্ত্রের মাপে এটি ইরাণের একটি ভয়ংকরতম ভূমিকম্প

১৯৬২ সালে খোরাসানে প্রায় ১৩ হাজার লোক মারা পড়েছিল। ১৯৭৮ সালে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে পড়েছিল তাবাশ ও সোয়াইয়েদ শহর। এখানে যত উঁচু বাড়ি ছিল, প্রথমে সেগুলোই ভেঙ্গে পড়ে। তাবাশের পাশেই মরুভূমি। এপাশের নিকটবর্তী ৪০টি জনপদ বিধ্বস্ত ও ৬০টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। সমস্যার মোকাবিলায় এই অঞ্চলে পাঠানো হয় ৭০০ সৈন্য, ডাক্তার, খাদ্য ও ওষুধপত্র। এই ভূমিকম্পের ফলে তেহরান শহরেও ভূকম্পন অনুভূত হয়। দরজা জানলার কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। এই ভূমিকম্পে মৃত মানুষদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য ইরাণ তিনদিন ধরে জাতীয় শোক পালন করে। এই তিনদিন বেতার ও টেলিভিশন থেকে সংগীত ও বাদ্য পরিবেশন বন্ধ ছিল। ১৯৭৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণে আবার ভূমিকম্প হয়। রিকটার স্কেলে এর তীব্রতা ৭˙৫। লোক মারা গিয়েছিল প্রায় ১০০০।

১৯৭৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি উত্তর-পশ্চিম চীনদেশে (পিকিং থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র) এবং ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে চীনদেশের তাংশান ও তিয়েনসিন অঞ্চলে যে ভূমিকম্প হলো, এরকম ভূমিকম্প নাকি গত ২৫ বছরে আর হয়নি। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, ১৯৭৬ সালে ভূমিকম্পের তীব্রতা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত ১১ হাজার পারমাণবিক বোমার সমান।

১৯৭৪ সালে (২৮শে ডিসেম্বর) পাকিস্তানের এক ভূমিকম্পে প্রায় ৫৫০০ লোক নিহত ও ৬০,০০০ লোক গৃহহারা হয়েছে। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের অবস্থান ছিল রাওয়ালপিণ্ডির ১৫০ কিলোমিটার উত্তরে।

সাম্প্রতিককালে ১৯৭৯ সালের ৭ই আগস্ট সানফ্রানসিসকোর ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে হলিস্টার শহর ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। ভূমিকম্পের তীব্রতা রিকটার স্কেলে ৫˙৫ থেকে ৫˙৯ এর মধ্যে। ১৯৭৯ সালের ১৪ই নভেম্বরের এক ভূমিকম্পে ইরাণের মাসাদ শহরে

প্রায় ১০০০ লোক মারা যান। ঐ বছরে ৫ই নভেম্বর পশ্চিম জাভায় এক ভূমিকম্পে বেশ কিছু লোক মারা যায়। ১৯৮০ সালের ২৩শে জানুয়ারি পূর্ব-সাইবেরিয়ার কামচাটকা অঞ্চল এক প্রবল ভূকম্পনে কেঁপে ওঠে।

১২

ভারতীয় ভূমিকম্পের বিবরণ

ভারতীয় ভূখণ্ডে স্মরণীয় কালের মধ্যে যেসব ভূমিকম্প হয়েছে, তার মধ্যে ১৭৩৭ সালে কলকাতার ভূমিকম্পের কথা প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। সে সময় কলকাতার বেশির ভাগই ছিল মাটির কাঁচা বাড়ি, সেজন্য মানুষজন তেমন মারা পড়েনি। তবে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছিল। ১৮১৯ সালে (১৬ই জুন) কচ্ছের ভূমিকম্পে প্রায় ২-৩ হাজার লোক মারা যায়। ভূমিকম্পের ফলে সিন্ধুনদীর একটি শাখায় কৃত্রিম বাঁধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে। শিবং শহরের (মেঘালয়) চারপাশে প্রায় দেড় লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রবল ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণহানি ও অপূরণীয় ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল। রিকটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৮·৫ এর বেশি। ভূমিকম্প শুরু হবার দশ-পনেরো সেকেণ্ড আগে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেশ গম্ভীর গুড়গুড় শব্দ শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। তারপরই শুরু হয় প্রচণ্ড ভূকম্পন, যা প্রায় অন্তত মিনিট দুয়েক সক্রিয় ছিল। কিন্তু এই দু' মিনিটেই যা ধ্বংস লীলা চলে তা বর্ণনাতীত। রাস্তাঘাট জুড়ে দেখা যায় বিরাট ফাটল। শিলং শহরের অধিকাংশ বাড়ি, গীর্জা, ব্রিজ, স্কুল— সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। শিলং শহরের আশে পাহাড় জুড়ে ধস ভেঙ্গে পড়ে। গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমতল-ভূমিতে তৈরি হয় বিরাট বিরাট ফাটল, তা' থেকে ঝরণার মতো জল

বেরোতে শুরু করে, সঙ্গে বালি ও মাটি। এই ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৫ মাইল নিচে প্রায় ২০০ মাইল লম্বা একটি শিল্যচ্যুতিকে দায়ী করা হয়েছে। এই ভূমিকম্পের সর্বনাশ বৃত্তের মধ্যে পড়েছে, শিলং, গৌহাটি, শিলচর, মণিপুর, কোহিমা, ময়মনসিং (অধুনা বাংলাদেশ) ইত্যাদিকে নিয়ে একটি বিরাট অঞ্চল।

১৯০৫ সালে হিমাচল প্রদেশের কাংরা জেলার ভূমিকম্পে প্রায় ২০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

এরপর আসাম নয়, ভূমিকম্পের রোষ পড়ে নেপাল ও বিহারের ওপর। ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি, বেলা প্রায় সওয়া দু'টো। এমন সময়ে বিহারের উত্তরাংশ ও নেপালের দক্ষিণ ভাগ এক প্রবল ভূকম্পনে কেঁপে উঠল। এই ভূমিকম্পে মতিহারি, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, কাঠমানডু ও মুঙ্গের জেলার অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বন্যার জল সমস্ত অঞ্চলটিকে প্লাবিত করে ফেলে। কম করেও সেবার প্রায় ১২ হাজার মানুষ ভূমিকম্পের করাল গ্রাসে প্রাণ হারায়। এই ভূমিকম্পে সীতামারি, মধুবনী ও পূর্ণিয়া জেলার ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ণিয়া জেলার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ি ধ্বংস হয়ে হয়ে যায়। আর বাকি বাড়ির শতকরা ৯৫ ভাগই বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। গঙ্গার দক্ষিণে পাটনা, বাঢ় ও জামালপুর শহরে ও ধ্বংসের পরিমাণ যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং শহরও ধ্বংসের কবলে পড়ে। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল, সুদূর পেশোয়ার, বেজোয়াদা, আকিয়াব, ওঙ্গোল থেকেও ভূকম্পন অনুভব করা যায়। নেপালের উত্তরে তিব্বতে ভূমিকম্প হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই, তবে কাঠমানডুর তীর্থযাত্রীরা বলেছেন, তিব্বতের রাজধানী লাসায় নাকি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভারত ও তিব্বতের (চীন) প্রায় ৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়েনাকি এই ভূমিকম্প সক্রিয় ছিল। এই ভূমিকম্পের ফলে ভারতে জীবন হারিয়েছে প্রায় ৭২৫০ জন, আর নেপালে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩৪০০। ভূমিকম্পের তীব্রতা

প্রচণ্ড হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর সংখ্যা বেশ কম, কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দুপুরে ভূমিকম্প হওয়ার ফলে অধিকাংশ মানুষ ছিল বাড়ির বাইরে। আর যারা বাড়ির ভেতরে ছিল, তারাও বাড়ির বাইরে বেরোবার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই বেশি ছিল, যে এই ভূকম্পন পৃথিবীর সমস্ত ভূকম্পমাপক ষ্টেশনে ধরা পড়েছে। মারসেল্লী স্কেল অনুযায়ী এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল XI শ্রেণীর মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পলিমাটির নিচে শক্ত পাথরে বিচ্যুতি ঘটবার ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি।

এই ভূমিকম্প স্বচক্ষে দেখেছেন ও অনুভব করেছেন, এমন একব্যক্তি ইংরেজ সাহেব সি এইচ গরডন। সুরস্যাণ্ড রাজ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ঘটনার সময় মজঃফরপুরের ৩০ মাইল উত্তরের এক পথ দিয়ে গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভূমিকম্পের যে ছবি এঁকেছেন তাঁর বিবরণে, তা' একদিকে জলের মতো স্বচ্ছ, অন্যদিকে বেহালার সুরের মতো মর্মস্পর্শী। তিনি লিখেছেন, 'মজঃফরপুরের তিরিশ মাইল উত্তরে বেলস্যাণ্ড কারখানায় দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হলাম দুপুর ১-৪০ নাগাদ। আমার গন্তব্যস্থল তিরিশ মাইল পূর্বে। কিন্তু দুপুর দু'টোর একটু পরে যখন সবেমাত্র ৭ মাইল গিয়েছি, এমন সময় আমার গাড়ি ভয়ংকরভাবে দুলে উঠল। মনে হলো কে যেন আমাদের পেছনে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। গাড়ির ইঞ্জিন ঘড়ঘড় আওয়াজ করছিল, তাই কোন আওয়াজ পাইনি। কিন্তু আমার ড্রাইভার বলল, পশ্চিম দিক থেকে নাকি বিকট গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে। গাড়ির দুলুনি কমলে দেখতে গেলাম, রাস্তার দু'পাশে মাটির বাড়িগুলি ঝুপঝুপ করে ভেঙ্গে পড়ে গেল। আমার ডানদিকে একটা ন্যাড়া তালগাছ ভয়ংকরভাবে দুলছিল, যেন কোন পাগলা বুড়ো তাঁর লাঠিটাকে দোলাচ্ছে। এমন সময় বিস্মিত চোখের সামনে দেখলাম, সামনের সমস্ত প্রান্তর জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ফোয়ারা। জলের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও

মাটির ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে বালি। ঠিক যেন আগ্নেয়গিরি। কোন কোন ফোয়ারা প্রায় ৬ ফিট উঁচু।'

'মিনিট কয়েকের মধ্যে দেখলাম সমস্ত জায়গাটা জল আর বালিতে ভর্তি হয়ে গেল। ক্রমে জল বাড়তে শুরু করলে এক সময় আমাদের গাড়িটা ডুবতে শুরু করল। আমার ড্রাইভার ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে চলুন।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি আর আমার ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে হাঁটু-জলে নেমে পড়লাম। সেদিনটা ছিল মোটামুটি ঠাণ্ডা। কিন্তু জলে নেমেই দেখলাম, কী গরম জল রে বাবা, যেন পায়ে ফোসকা পড়বে। গ্রামের দিকে এগোতেই দেখলাম অসংখ্য গ্রামবাসী তাঁদের ভাঙ্গা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছে। প্রায় আধঘণ্টা পরে জলের ফোয়ারার তোড় কমলে প্রান্তরের জল একটু একটু করে কমতে শুরু করল।

'ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ পায়ে হেঁটে আবার ফিরে চললাম বেলস্যাণ্ডের দিকে। কিছুক্ষণ আগে যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছি, সে রাস্তার আর চিহ্নমাত্র নেই। জল আর বালির তলায় সে রাস্তা হারিয়ে গেছে। জল ঠেলে তিন চার মাইল হেঁটে গিয়ে দেখলাম, মিঃ ও মিসেস ডবসন একটা গাছের নিচে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন। ভূমিকম্পে ওদের বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে।'

আমরা সবাই ওখানে আটকে পড়েছিলাম। খবর দেওয়া নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। দিন কয়েক ওখানে গাছতলায় কাটাবার পর, অতিকষ্টে একটি পাল্কি জোগাড় হলো। পাল্কি বইবার জন্য ২৪ জন লোক। ঠিক হলো পাল্কি চেপেই ৩০ মাইল দূরে বাড়ি ফিরব। ফেরবার সময় পথে জল আর বালিতে বসে যাওয়া গাড়িটা অতিকষ্টে উদ্ধার করে কাছেই এক ভদ্রলোকের বাড়ি রেখে গেলাম। পথে দু'টো পাহাড়ী নদী পড়ল। নদী দু'টিতে এখন বন্যা। আর কী ঠাণ্ডা জল। বুঝলাম, নেপাল থেকে নেমে আসা নদীর সঙ্গে বরফের চাঙ্গড়ও ভেঙ্গে নেমে এসেছে।'

'দুপুর একটা নাগাদ সীতামারি শহরে পৌঁছলাম। একে এখন শহর না বলে ইটের পাঁজা বলাই ভালো। শহরে একটি বাড়িও আস্ত নেই। সারা শহরে প্রায় দু'-তিনশো মানুষের মৃতদেহ। নেহাত দুপুরবেলায় ভূমিকম্প হয়েছে, দুপুর দু'টোয় না হয়ে রাত দু'-টোয় ভূমিকম্প হলে যে কী হতো, তা' ভাবতেও শিউরে উঠছি। শহরের হাসপাতাল ভেঙ্গে পড়ায় সব রোগী মারা পড়েছে, কেবল একমাত্র একজন রোগী ছাড়া। জেল ভেঙ্গে গেছে। কয়েদীরা সব পালিয়েছে। আমার তিরিশ মাইল যাত্রাপথে দেখলাম, পাঁচটা ব্রিজ ভেঙ্গে পড়েছে, রাস্তাঘাট সব ভেঙ্গে চুরমার। রাত আটটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে দেখলাম, আমার বড় সাধের বাংলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সারাটা রাত পাল্কিতেই কাটাতে হলো। কোথাও এক ফোঁটা খাবার জল নেই। কুঁয়োগুলো সব বালিতে ভরে আছে।'

১৯৩০ সালে আসামের ধুবড়িতে ভূমিকম্পের পর ১৯৩৫ সালের ৩১ মে নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে বেলুচিস্থানের কোয়েটা ও কালাট শহর (এখন অবশ্য পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দামামায় কেঁপে উঠল। মৃত্যু পথযাত্রীদের আর্ত চিৎকারে অন্ধকার রাত্রির আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেল।

১৯৩৭ সালে (২০ অক্টোবর) দেরাদুনের কাছে এক ভূমিকম্পে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। কাশ্মীর, সিমলা-কুমায়ুন পাহাড়, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে কম্পন অনুভূত হয়েছে। এরপর ১৯৩৮ সালে আবার ভূমিকম্প হলো সাতপুরা পাহাড় অঞ্চলে। ভূকম্পন কেন্দ্র ছিল ভূ-পৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার গভীরে। তৎকালীন রাজপুতানা (রাজস্থান), কাথিয়াওয়াড় (গুজরাট); মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ দেশীয় রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

১৫ই আগস্ট, ১৯৫০। স্বাধীনতার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব পালন

শেষ। এমন সময় সন্ধ্যে ৭-৪০ মিনিটে তৎকালীন আসাম রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এক ভীষণ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই প্রচণ্ড ছিল যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভূমিকম্পমাপক কেন্দ্র থেকে এই ভূমিকম্প অনুভব করা গেছে। শুধু অনুভব করা নয়, এই ভয়ংকর ভূমিকম্পকে সবাই নানা বিশেষণে ভূষিত করেছে। যেমন 'ভয়ংকর, প্রচণ্ড, অভূতপূর্ব, ভয়াবহ' ইত্যাদি বিশেষণগুলি বোঝা যায় যে পৃথিবীতে এত প্রচণ্ড ভূমিকম্প এর আগে খুব কমই হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকম্প-বিশারদদের মতে, এটি পৃথিবীর পাঁচটি প্রচণ্ডতম ভূমিকম্পের একটি। রিক্টার স্কেল অনুযায়ী এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ৮.৫। পৃথিবীর ভয়ংকরতম অন্য চারটি ভূমিকম্প হলো আসাম (১২ই জুন, ১৮৯৭), লিসবন (১লা নভেম্বর, ১৭৫৫), কানসু (চীন) (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২০), বিহার ও নেপালে (১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৪) ভূমিকম্প। আসামের এই ভূমিকম্প প্রায় ১৫,০০০ বর্গমাইল এলাকা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে উত্তর লখিমপুর, ডিবরুগড়, জোরহাট, তিনসুকিয়া, সদিয়া, শিবসাগর ইত্যাদি মহকুমা অঞ্চল ও আবর ও মিকামি পাহাড়ী অঞ্চল। প্রায় ১০ কোটি টাকার ধনসম্পত্তি নষ্ট হলেও, ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর সংখ্যা কম। এর কারণ সম্ভবত এই যে, এমন সময় ভূমিকম্প হয়েছে, মানুষ তখন সজাগ ছিল। ফলে নিরাপদ স্থানে পালাতে তেমন অসুবিধে হয়নি। এই ভূমিকম্পের ফলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও শস্যক্ষেতে দেখা দিয়েছে বিরাট ফাটল, যার ভেতর থেকে জল ও বালি বেরিয়ে এসে চারচিক প্লাবিত করেছে। আবার কোথাও বা বিশাল মাটির চাঙ্গড় ধ্বসে গিয়ে সৃষ্টি করেছে বিস্তৃত জলাভূমি। ডিব্রুগড়ের কাছে রেললাইল, প্রচুর রাস্তাঘাট, ব্রিজ ভেঙ্গে চুরমার। আবর ও মিশমি পাহাড়ে ধস নেমে অনেক নদীর পথরুদ্ধ করে পরে বন্যার সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে ডিহং, ডিবং ও সুবনসিরি নদীর কথা উল্লেখ্য। এই ভূমিকম্পের রেশ বেশ

ভালোভাবে অনুভব করা গেছে বেনারস (কাশী), কলকাতা ও রেঙ্গন থেকে। এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল আসাম-চীন সীমান্তে রিমা শহরের উত্তর-পূর্বে। চীন দেশের ভেতরে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার কোন বিবরণ জানতে পারা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠের নিচে শিলাচ্যুতির ফলে। ভূকম্পন-কেন্দ্রের সম্ভাব্য গভীরতা ১৪ কিলোমিটার।

১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর। শীতের সকালে তখনো সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় হঠাৎ খেয়ালী প্রকৃতির প্রচণ্ড তাণ্ডবে থরথর করে কাঁপতে লাগল পশ্চিম মহারাষ্ট্রের এক বিরাট অঞ্চল। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায় কয়নানগর। শুধু তাই নয়, আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চল-সাতারা, সাংলি, কোলাপুর ও রত্নগিরি জেলায় কম করেও হাজারটি গ্রামের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল হয়ে পড়ল। আড়াই লক্ষের বেশি নরনারী গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। মৃতের সংখ্যা প্রায় দু'শোর কাছাকাছি এবং আহতের সংখ্যাও কম নয় —প্রায় আড়াই হাজারের মতো। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। কয়নার কাছে কারাড চিপলাল রাস্তায় একটি ব্রিজের তিনটি খিলান ভেঙ্গে চুরমার। অবশ্য কয়নাবাঁধ ও স্পিলওয়ে গেট অদ্ভুতভাবে এই তীব্র কম্পন সহ্য করেছিল। কিন্তু বাঁধের ওপরে হয়েস্ট টাওয়ার। স্পিলওয়ে ব্রিজ এবং কনট্রোল ঘরটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। ভূমিকম্পের এই তাণ্ডব শুধু মহারাষ্ট্রের ওপরই আঘাত হানে নি, ফাটল ধরিয়াছে ভূবিজ্ঞানীদের চিরকালের বিশ্বাসের ভিত্তে। প্রমাণ করেছে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলকে যতখানি অনড় মনে করা হতো, ততখানি অনড় সে নয়। ১৯৬২ সালে মহারাষ্ট্রের কয়না বাঁধের জলাধার ভর্তি হবার পর থেকেই কখনো কখনো মৃদু ভূকম্পন হতে থাকে। কিন্তু পরের বছর বর্ষাকালে বাঁধের জল আরো বৃদ্ধি পেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ও সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ করে কর্তৃপক্ষ কয়নানগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ এই

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই মহারাষ্ট্রের শতকরা ৪০ ভাগ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। এরপর ভূকম্পনের কারণ অনুসন্ধানের ভার পড়ে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ গবেষণা দপ্তরের ওপর। এই দপ্তরের অভিমত আমেরিকার বোলডার ড্যামর মতো কয়নানগর জলাধারের চাপে কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তেমন ভয়ের কিছু নেই, বছর কয়েকের মধ্যে ভূত্বকে ভারসাম্য ফিরে এলেই এই কম্পন থেমে যাবে। কিন্তু ভূবিজ্ঞানীদের ধারণাকে নসাৎ করে ১৯৬৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কয়নানগর কেঁপে উঠল। বেশ খানিকটা দূরের শহর পুনেতেও ভূমিকম্পের কাঁপুনি বোঝা গেল। ভূকম্পন কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণীত হলো ৬ থেকে ১০ কিলোমিটারের মতো। এই ভূমিকম্পের ফলে কয়নানগরর কিছু বাড়ি বিধ্বস্ত, বেশ কিছু অধিবাসী আহত হলো। অপ্রত্যাশিত এই ভূকম্পনে বিশেষজ্ঞরা কিছুটা বিস্মিত হলেও এবার কিন্তু বললেন, এই শেষ, এর পর ভবিষ্যতে জোরালো কোন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নেই। অথচ তারপর তিন মাসও কাটল না—১১ই ডিসেম্বর ভূবিজ্ঞানীদের সব ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে কয়নানগর ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল—একথা আগেই বলা হয়েছে। কয়নার এই ভূমিকম্পে কিন্তু বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। তীব্র ভূমিকম্পে সাধারণত ভূমিস্খলন, ভূমির অধোগমন, ফাটলের সৃষ্টি, জলপিঠের (water table) পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নয়নার বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন চোখে পড়েনি। কেবকমাত্র কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাসল্ট পাথর গ্রন্থি ধরে ভেঙ্গে পড়েছে এবং কেবলমাত্র কয়না বাঁধের কাছে সানেল থেকে দক্ষিণের ভারনা উপত্যকা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত মাটির ওপর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা কয়েকটি ফাটল দেখা গেছে এবং কংকন এলাকায় প্রস্রবণগুলির তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। কয়না ভূমিকম্প সম্পর্কে পর্যালোচনা করে ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র

কয়না বাঁধ থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। কিন্তু আরেকদল বিজ্ঞানীর মতে, এই উপকেন্দ্র কয়না বাঁধের কিছু উত্তরে। কয়না ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাপ ও কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয়ে ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে তীব্রতার পরিমাণ রিকটার স্কেল অনুযায়ী ৬.৫ থেকে ৭.৫ এবং ভূকম্পনকেন্দ্রের গভীরতা ১৬ কিলোমিটার থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

কয়েক বছর আগে ১৯৭৫ সালে ১৯শে জানুয়ারির এক ভূমিকম্পে হিমাচল প্রদেশে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

সাম্প্রতিক কালে ১৯৭৯ সালের ৫ই আগস্ট ওড়িশার বারিপদায় মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ১৯৭৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর ভোরবেলায় শিলং শহরে এক মৃদু ভূকম্পন অনুভব করা গেছে।

১৩

ভূমিকম্প কেন, কোথায়, কবে ?

সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে পৃথিবীর বুকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। যেমন, (১) ভূপৃষ্ঠ জনিত (২) আগ্নেয়গিরি জনিত এবং (৩) শিলাচ্যুতি জনিত।

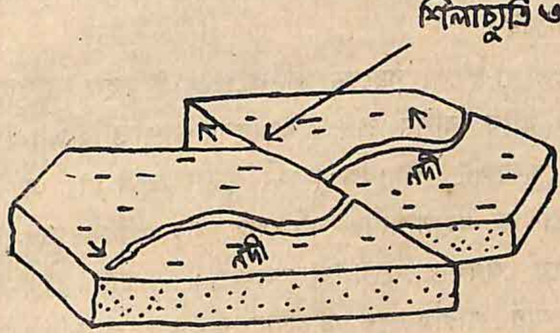
(১) ভূপৃষ্ঠ জনিত : পাহাড়ী অঞ্চলে ধস নামবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯১১ সালে তুর্কিস্থানের ভূমিকম্পে পামীর উপত্যকা অঞ্চলে ৫০,০০০ কোটি টন ওজনের বিশাল ধস (landslide) পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিরাট ধস নামবার ফলেই এই ভূমিকম্প। প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী আর ডি ওল্ডহ্যাম তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূকম্পনের ফলেই পাহাড়ী জায়গায় সর্বনাশা দূতের মতো বিরাটকায় ধস নামতে শুরু করে। কিন্তু ধস আগে না ভূমিকম্প আগে ? এই প্রশ্নের সদুত্তর, 'ডিম আগে না মুরগী আগে'র মতোই

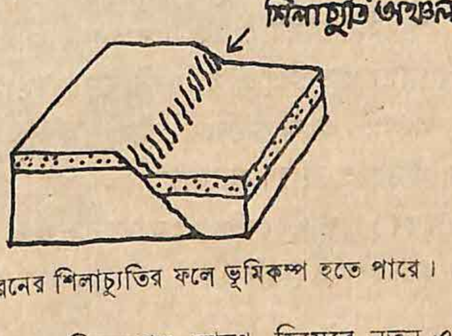
পাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মহাদেশের উপকূলভাগে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে যে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়, তা' ক্ষীণ হলেও কলকাতায় আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের যন্ত্রে প্রায়ই ধরা পড়ে।

(২) আগ্নেয়গিরি জনিত কারণঃ বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা যায়, অনেক সময় বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসবার জন্য প্রচণ্ড শক্তিতে যখন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে ভূস্তরে আঘাত করতে থাকে, তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৩ সালে জাভার ক্রাকাতোয়ায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। একই বছরে জাপানের বন্দইসানে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা স্রোত নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প হয়েছিল।

(৩) শিলাচ্যুতি জনিত কারণঃ আধুনিক ভূবিজ্ঞানীদের মতে, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতিকেই ভূমিকম্পের মূল কারণ বলে মনে করা হয়। ১৯০৬ সালের সানফ্রানসিসকো ভূমিকম্প ও সান আনড্রিয়াস শিলাচ্যুতির **(fault)** কার্যকারণ সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে অধ্যাপক এইচ এফ রিড ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপহার দেন। এই তত্ত্ব তাঁর সুদীর্ঘ অনলস চিন্তার ফসল। এই স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত তত্ত্বের **(Elastic Rebound Theory)** সাহায্যেই তিনি বিশ্লেষণ করেন। তিনি লক্ষ করেছেন, সম্ভাব্য শিলাচ্যুতি তলের দু'পাশে নানা কারণে ক্রমশ টান পড়তে থাকে। ফলে শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পক্ষে আর শক্ত ও স্থির অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচমকা বিচ্যুতি ঘটে। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তরটিকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এই বিরাট

শিলাচ্যুতির ফলে কাঁপতে থাকে পারিপার্শ্বিক সমস্ত শিলাস্তর এবং উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পের। শিলার চ্যুতিবিচ্যুতি ভঙ্গিল পর্বতমালার মধ্যেই বেশি। তাই এসব অঞ্চলেই আকছার ভূমিকম্প হয়। ১৮৯৭ সালে চিদরং শিলাচ্যুতির ফলে একটি ভূস্তর প্রায় ৩৫ ফিট নিচে নেমে গিয়েছিল। পেরু (১৯৭০) কিংবা ইরানের (১৯৭৮, ১৯৭৯) সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণও অন্য কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিলাচ্যুতির ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি।





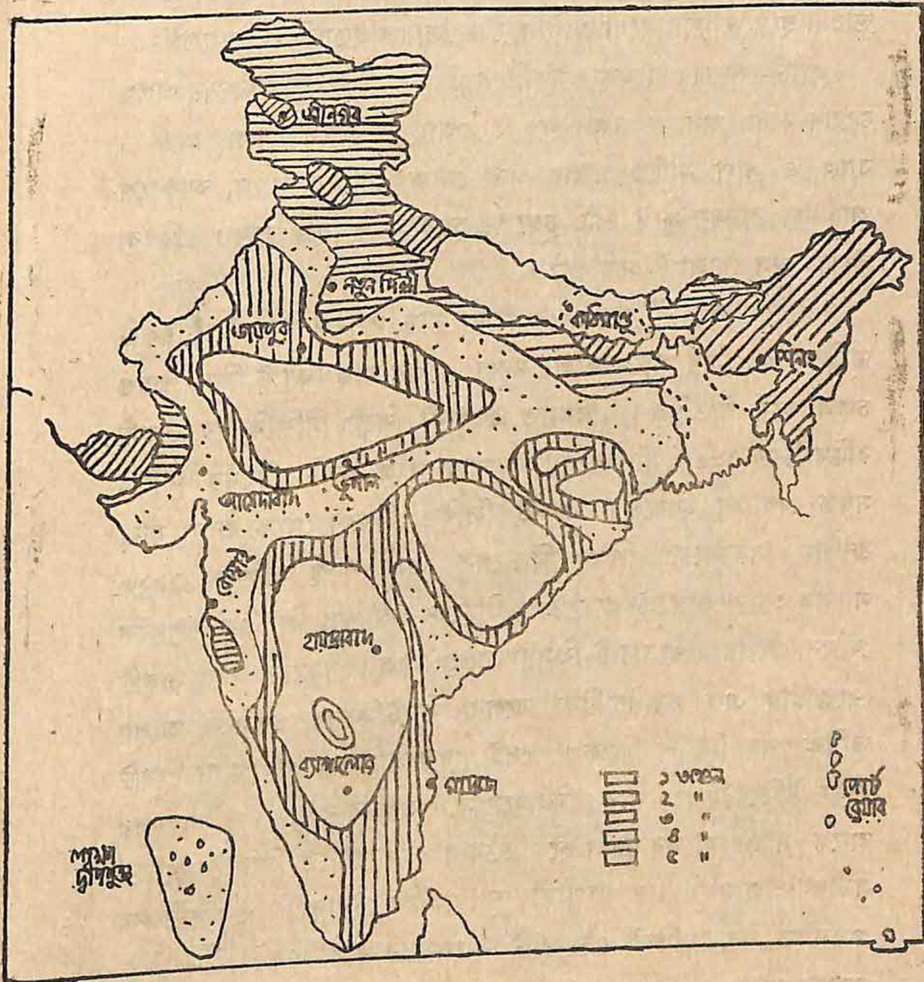
এ ধরনের শিলাচ্যুতির ফলে ভূমিকম্প হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে নতুন একটি তত্ত্বকে মেনে নিচ্ছেন একদল ভূবিজ্ঞানী। নাম 'প্লেট টেকটনিকস্ তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের হিসেবে ভূত্বক কতকগুলি প্লেট (বা খণ্ড) দিয়ে তৈরি। এক একটি প্লেটের মধ্যে মহাদেশ ও সমুদ্রতলদেশের অংশবিশেষ রয়েছে।

বহু প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক যুগে মহাদেশগুলি একসঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ছিল। পরে এগুলি ভেঙ্গে যায় কতগুলি প্লেটে, আর তারপর পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরতে শুরু করে। এভাবে চলতে চলতে একটি প্লেট যখন আর একটি প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখনই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। নামে প্লেট হলেও এক একটি প্লেটের আকার বিরাট হতে পারে। আফরিকার মতো মহাদেশের আকারেরও প্লেট রয়েছে।

কোন কোন ভূকম্পবিদদের মতে বাঁধের জলাধারের চাপে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। মহারাষ্ট্রের কয়না নগরের ভূমিকম্পের উৎপত্তি এভাবেই।

গত দেড়শো-দু'শো বছরের ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি বিশেষ কয়েকটি পর্বতমালা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ (১নং পৃষ্ঠায় ছবি)। এর মধ্যে প্রধানতম প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিমণ্ডল, যা প্রশান্ত মহাসাগরকে চারদিক থেকে মেখলার মতো ঘিরে রয়েছে। অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল, যার পরিধি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে হিমালয় ও এশিয়া মাইনর হয়ে আলপস পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছেছে। পৃথিবীর প্রায় নব্বই শতাংশ ভূমিকম্পই এই দু'টি অঞ্চলের মধ্যে সামাবদ্ধ। পৃথিবীর যেসব দেশগুলিতে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতালি, গ্রীস, তুর্কী, ইরাণ, ভারতের উত্তরাঞ্চল, ইন্দোচীন অঞ্চল, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল ও মধ্য আমেরিকা। ভূমিকম্পের প্রবণতা হিসেবে ভারতকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে (ছবি)।



ভূমিকম্পের প্রবণতা হিসেবে ভারতকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ৫নং অঞ্চল সবচেয়ে ভূমিকম্প-প্রবণ।

আবহাওয়া পূর্বাভাষের মতো ভূমিকম্পের পূর্বাভায দেওয়া সম্ভব কি? এ প্রশ্ন নিয়ে শুধু সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীরা নয়, প্রাচীন কালের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরাও এ নিয়ে বিস্তর চিন্তাভাবনা করেছেন। ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ সম্পর্কে প্রাচীনকালে যেসব দেশে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, তার মধ্যে জাপান, চীন, ভারত ইত্যাদি দেশ অগ্রগণ্য।

প্রাচীনকালের অনেক কাহিনীতে কথিত আছে, ভূমিকম্পের আগে জলের মধ্যে অসম্ভব চঞ্চল হয়ে ওঠে মাছ (বিশেষত মাগুর মাছ)। ব্যাঙ ও সাপ মাটির তলার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, আকাশে আচমকা রামধনু ফুটে ওঠে, চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা কুঁয়োর জল ঘোলাটে হয়ে ওঠে।

প্রাচীন জাপানী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি ভূমিকম্পের কিছু আগে জলের মধ্যে মাগুর মাছ (ক্যাট ফিস) প্রচণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী নিশিকি-ইর একটি রঙিন চিত্রে ১৮৫৫ সালের ভূমিকম্পের সঙ্গে ক্যাট ফিসের বিচিত্র সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। একটি লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, জাপান সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক পদস্থ অফিসার ১৯২৬ সালের ৩১শে আগস্টে কানতো ভূমিকম্পের আগের দিন একটি পুকুরে দেখেন, জলের মধ্যে ক্যাট ফিসরা প্রচণ্ড চঞ্চল। পুকুরের পাশে একটি রেস্তোরার এক পরিচারিকা বলেন, ক্যাটফিসের চঞ্চলতা আসন্ন ভূমিকম্পের নির্দেশ দিচ্ছে। সেই পদস্থ অফিসার প্রথমে ব্যাপারটি হেসে উড়িয়ে দিলেও পরের দিন মর্মে মর্মে অনুভব করেন। ভূমিকম্পের আগে মাগুর মাছের চঞ্চল হয়ে ওঠবার ব্যাপারটিকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালান বিখ্যাত জাপানী ভূপদার্থবিদ টেরাদা। ওঁর সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়, সত্যিই এই দু'টি ব্যাপারের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক আছে।

আর একটি প্রাচীন বিশ্বাস এই যে, ভূমিকম্পের আগে তার আগমন সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায় ছোট ছোট প্রাণীরা।

১৮৯১ সালে জাপানের নোবি শহরের ভূমিকম্প সম্পর্কে এ ধরণের একটি গল্প চালু আছে। নাগোয়া শহরের একটি রেস্তোরার চলতি নাম ছিল 'ইঁদুর বাড়ি'। ঐ রেস্তোরায় ছিল অনেকগুলি পোষা ইঁদুর। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ভূমিকম্পের ঠিক আগের দিন ইঁদুরগুলি কোথায় যেন পালিয়ে যায়।

একই কারণে ১৮৫৫ সালে ইডো ভূমিকম্পের প্রায় সপ্তাহখানেক আগে থেকে মুরগীগুলোকে কিছুতেই তাদের খাঁচায় ঢোকানো যাচ্ছিল না।

এ সব ছাড়াও এমন বহু জাপানী কাহিনী শোনা যায়, যাতে বেশ কিছু উন্মাদ বা ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ আসন্ন ভূমিকম্প সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে পূর্বাভাষ করেছেন।



প্রাচীন এই চীনা যন্ত্রে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ সূচিত হতো।

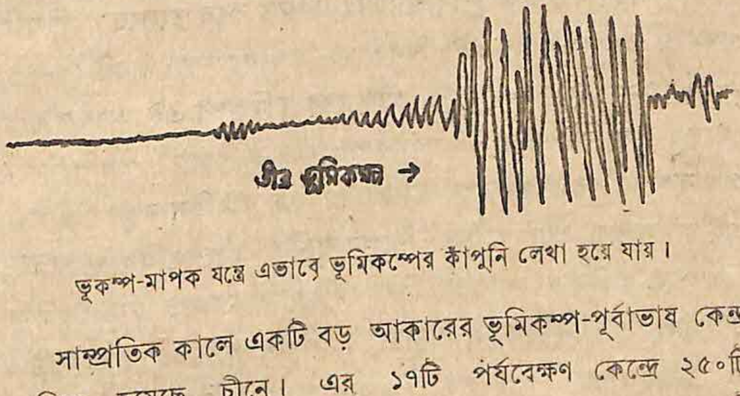
জ্যোৎস্না বা অমাবস্যার সঙ্গেও ভূমিকম্পের কিছু সম্পর্ক লক্ষ

করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানী এ, পিরি বলেছেন, পূর্ণিমার সময়ই নাকি অধিকাংশ ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রথমে যে চীনা বিজ্ঞানী তাৎপর্যময় কিছু করেছেন আর নাম জান হেন (৭৮-১৩৯ খৃঃ)। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ঠিক করবার জন্য তিনি এক ধরনের পাত্রের ভেতরে রাখেন একটি ঝুলন্ত পেনডুলাম, তার সঙ্গে ৮টি কপিকল কোনাকুনি জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি কপিকলের বাইরের দিকে শেষপ্রান্তে লাগানো ৮টি ড্রাগন। প্রত্যেকটি ড্রাগনের হাঁ-করা মুখে একটি করে বল আটকানো রয়েছে। ভূমিকম্পের সময় কপিকলে টান পড়ে ড্রাগনের মুখ পুরোপুরি খুলে বল পড়ে যায় নিচে। আর পড়বি তো পড়, পড়ে নিচে বসিয়ে রাখা ব্যাঙের মুখে। ড্রাগনের মুখ থেকে ব্যাঙের মুখে বল পড়লেই বুঝতে হবে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সেই প্রাচীনকালেই এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরের ভূমিকম্পও বুঝতে পারা যেত।

প্রতি বছর ভূমিকম্পের ফলে সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ মারা যায়। তাই ভূমিকম্প সম্বন্ধে যদি পূর্বাভাষ করা যায়, তবে এই মৃত্যুর হার নিশ্চয়ই অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাষের অর্থ হলো কখন কতটা তীব্রভাবে ভূমিকম্প হতে পারে, তা আগেভাগে বলতে পারা। এখনো পর্যন্ত কখন কতটা তীব্র ভূমিকম্পের সম্ভাবনা, তা হয়তো মোটামুটি ভাবে বলতে পারা সম্ভব, কিন্তু কবে কখন হবে, এই প্রশ্ন নিয়ে ভূ-বিজ্ঞানীরা বিব্রত। একথা জানা আছে, ভূমিকম্পের কিছু আগে থেকেই ভূমিকম্পগ্রস্থ অঞ্চলের ভূমি মৃদু কাঁপতে থাকে এবং মাঝে মধ্যে তা' হেলে পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে ভূমির এই হেলে পড়ার পরিমাণ ভূমিকম্প-পূর্বাভাষ কেন্দ্রে পাঠালে তা' বিশ্লেষণ করে হয়তো আনুমানিক ভাবে ভূমিকম্পের দিনক্ষণ আগাম বাতলে দেওয়া সম্ভব। তবু এখনো পর্যন্ত যন্ত্রপাতির অভাব ও তথ্য-বিশ্লেষণের সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হওয়ায় ভূমিকম্পের আগাম আভাষ নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এসব সত্ত্বেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানে। সাইবেরিয়ার ভূমিকম্প গত ২০ বছর ধরে ভালোভাবে সমীক্ষা করে ১৯৪৯ সালে রাশিয়ান ভূবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ভূমিকম্পের আগে ভূগর্ভে ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগের একটি বিশেষ অনুপাত প্রচণ্ডভাবে কমে যায়। আমেরিকান ভূ-বিজ্ঞানীরাও সমীক্ষা চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাছাড়া রাশিয়ান ভূবিজ্ঞানীরা আরো দেখেছেন, ভূমিকম্পের কিছু আগে ভূ-গর্ভস্থ জলের রাসায়নিক চরিত্র অনেকটাই বদলে যায়। এ জাতীয় নানা পন্থা ও পদ্ধতির সাহায্যে রাশিয়ান ভূ-বিজ্ঞানীরা ১৯৬৬ সালের (২৬ এপরিল) তাশখন্দ ভূমিকম্প সম্পর্কে সঠিকভাবে পূর্বাভাষ করতে পেরেছিলেন।



ভূকম্প-মাপক যন্ত্রে এভাবে ভূমিকম্পের কাঁপুনি লেখা হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক কালে একটি বড় আকারের ভূমিকম্প-পূর্বাভাষ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে চীনে। এর ১৭টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ২৫০টি ভূকম্পমাপক কেন্দ্র থেকে খবর আসে। তাছাড়া আরো ৫০০০টি ছোট পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকেও খবরাখবর পাঠানো হয়। এই কেন্দ্র-গুলির সাহায্যেই সাম্প্রতিক কালে দু'টি বড় আকারের ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ করা সম্ভব হয়েছে।

ভূকম্প-বিশারদরা মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতে শুধু ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্বাভাষ নয়, ভূমিকম্প যাতে না হয় অথবা তীব্রতা হ্রাস পায়, এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নেওয়া সম্ভব হবে।

ভারতেও অনুরূপভাবে ভূমিকম্প সম্বন্ধে নানা সমীক্ষা ও গবেষণা চলছে। যে সব প্রতিষ্ঠান ভূমিকম্প বিষয়ে অগ্রণী হয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে রুরকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প প্রযুক্তি বিদ্যা বিভাগ, আবহাওয়া বিভাগ, ন্যাশানাল জিয়োফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জিয়োলজিক্যাল সারভে অফ ইনডিয়া, সেনট্রাল ওয়াটার য়্যাণ্ড পাওয়ার রিসার্চ স্টেশন, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেনটার, ও বিভিন্ন ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি নামক শিক্ষাসংস্থাগুলি। ভূমিকম্প প্রতিরোধক-ব্যবস্থা হিসেবে বাড়ি তৈরির নতুন ডিজাইনও উদ্ভাবিত হচ্ছে।

১৯৮০-৮১ সালে ভারতের-উত্তর পূর্বাঞ্চল কি এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কবলে পড়বে? এমন একটা প্রশ্ন সম্প্রতি আতংকের মতো সাধারণ মানুষ ও ভূ-বিজ্ঞানীদের চিন্তিত করে তুলেছে। চিন্তার প্রথম ও প্রধান কারণ এই, বিগত ১০০ বছরের মধ্যে চারটি (১৮৬৯, ১৮৯৭, ১৯৩০, ১৯৫০) বড় আকারের ভূমিকম্প এই অঞ্চলে ঘটে গেছে। সম্প্রতি সম্ভাব্য এই ভূমিকম্প নিয়ে ভূ-বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও প্রশাসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্র বসেছিল নতুন দিল্লীতে। এই আলোচনা চক্রে হাজির ছিলেন স্থানীয় প্রদেশগুলির প্রতিনিধি, নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তা, জিয়োলজিক্যাল সারভে অফ ইনডিয়া, ন্যাশনাল জিয়োফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ভারতের আবহ বিভাগ ও জোরহাটের আঞ্চলিক গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞবৃন্দ। এই আলোচনা চক্রে স্থির হয় এই অঞ্চলের ভূকম্প-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলির কাজকর্ম আরো জোরদার করা হবে। তাছাড়া ভূমিকম্প হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অসামরিক প্রশাসনকে অত্যন্ত সজাগ ও সক্রিয় করে তোলা হবে। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। সাধারণ মানুষ ভূমিকম্পের হাত থেকে কীভাবে কতটা অব্যাহতি পেতে পারেন!

এই ভূমিকম্পের আতংকের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে মেঘালয়ের

বোকো পাহাড় অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির সজীব হয়ে ওঠার খবর। বোকো পাহাড়ের দূরত্ব গৌহাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। এখানে বাতাকচিতে প্রথম আগ্নেয়গিরির হদিশ মিলেছিল। ১৯৭৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাহাড়ের মাথায় এক জায়গা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে স্থানীয় রাখাল ছেলেরা। গরম ধোঁয়ায় আশেপাশের পাথরগুলো বেশ উত্তপ্ত। পরে খবর পেয়ে জিয়োলজিক্যাল সারভে অফ ইনডিয়ার বিশেষজ্ঞরা পাহাড়ের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তবু ধোঁয়া চুঁইয়ে বেরোচ্ছে, সঙ্গে গন্ধকের ঝাঁঝালো গন্ধ। তাছাড়া আরো খবর পাওয়া গেছে, এই বোকো পাহাড় অঞ্চলে মৃদু ভূমিকম্প হয়ে গেছে, যা গৌহাটি শহরে বসেও অনুভব করা গেছে। কে বলতে পারে বোকো পাহাড়ের এই মৃদু ভূকম্পন এক আসন্ন বিধ্বংসী ভূমিকম্পের বার্তা বহন করছে না!

লেখকের অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ :

ভারতের খনিজ সম্পদ

পৃথিবীর গল্পকথা